পত্র ভারতী প্রকাশন

৫ জুলাই ২০০৮ দশ টাকা

৪০ বছর

কিশোর ভারতী

ডাকাত! ডাকাত!

অর্জুনের রহস্য-ধারাবাহিক সমরেশ মজুমদার

বিশ্বসাহিত্যের গল্প দেবাশিস সেনগুপ্ত

অন্যান্য গল্প কুমার মিত্র কল্যাণ মৈত্র সৌম্যনারায়ণ আচার্য সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসিত রায়চৌধুরী

রঙিন কমিকস হর্ষবর্ধনের চৌকিদারি নন্টে ফন্টে সহ আরও ৪ কমিকস

খেলা রাতুল ঘোষ নিয়মিত আসর

মূল কাহিনি **শিবরাম চক্রবর্তী** চিত্রনাট্য ও সংলাপ **ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়**
ছবি **প্রদীপ চক্রবর্তী**

হর্ষবর্ধনের চৌকিদারি

এরপর ৬৭ পৃষ্ঠায়

কিশোর ভারতী ৪০ বর্ষ দশম সংখ্যা ● আষাঢ় ১৪১৫ ● জুলাই ২০০৮ ৪০ বছর

'হারে-রে-রে-রে-রে' ডাকাত বলতেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ভয়ংকরদর্শন একদল মানুষের মুখ, যারা রাতের অন্ধকারে গৃহস্থের বাড়ি চড়াও হয়ে সব লুঠপাঠ করে নিয়ে যায়! বাংলাসাহিত্য জুড়ে এমন কত ডাকাত-চরিত্র! বাস্তব কিন্তু ঠিক এমনটি নয়। তাহলে কেমন?

যুগ-যুগ ধরে নানান ধরনের ডাকাতি ঘটেছে, চরিত্রেও তারা পুরোপুরি আলাদা। রোমাঞ্চকর সেকাল ও একালের 'ডাকাত'-তথ্য নিয়ে প্রচ্ছদকাহিনি

ডাকাত! ডাকাত! স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ৯

গল্প

দেবানন্দ
কুমার মিত্র ১৯
লকা
কল্যাণ মৈত্র ২৭
ভদ্রানদীর তীরে
সৌম্যনারায়ণ আচার্য ৩৬

শেষ দৃশ্য
সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭
বাঘ ও বিপ্লবী
প্রসিত রায়চৌধুরী ৫০

বিশেষ বিজ্ঞান নিবন্ধ

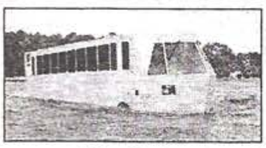

নতুন প্রযুক্তির উভচর যান
সুরজিৎ মুখোপাধ্যায় ৫২

ছড়া কবিতা

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়
স্নেহাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়
গৌতম হাজরা ৬৩

গোয়েন্দা অর্জুনের ধারাবাহিক

সমরেশ মজুমদার

মুশকিল আসান ২৩

যাচ্ছি

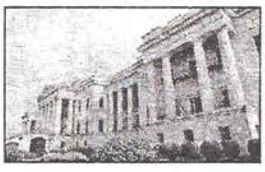

মুর্শিদাবাদের পথে পথে
স্বপন বক্সী ৫৩

নিয়মিত আসর

আমাদের কথা	৭
তোমাদের কথা	৬
তোমাদের দপ্তর	৮
বিজ্ঞান	৩২
হাঃ হাঃ হি হি	৩৩
কুইGK	৩৪
ভালো থেকো	৪৬
কোথায় কী আশ্চর্য	৫৫
কার্টুন	৫৬
চাই! চাই না!	৫৯
বইয়ের দুনিয়া	৬২
হরে কর কম	৬৪
টুকরো খবর	৪৫, ৫১

সম্পূর্ণ রঙিন কমিকস

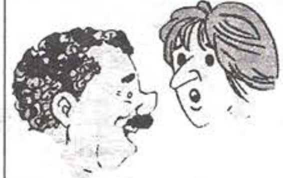

শিবরাম চক্রবর্তী
হর্ষবর্ধনের চৌকিদারি ২
চিত্রনাট্য ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়
ছবি প্রদীপ চক্রবর্তী

বিশ্বসাহিত্যের গল্প

ভোরের অতিথি
দেবাশিস সেনগুপ্ত ৪২

কমিকস

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ ৪
আরব্য রজনীর গল্প
অমর মজুমদার ৩০
বগলা অ্যান্ড কোং
জুরান নাথ ৪০
সজারু আর কেউটে সাপ
সুদীপ্ত মণ্ডল ৬০

খেলা

সব ম্যাচ জিতে স্পেন ইউরো চ্যাম্পিয়ন
রাতুল ঘোষ
৫৭

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
সহ-সম্পাদক তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যসচিব মানস চক্রবর্তী
কার্যালয় সচিব অনিমেষ পাল ॥ শুভাশিস লাহিড়ী ॥ শাশ্বত সে
কম্পিউটার গ্রাফিক্স বরুণ রায়
প্রচ্ছদ সৌরীশ মিত্র
কর্মাধ্যক্ষ চুমকি চট্টোপাধ্যায়
প্রধান কার্যালয় ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন ২৩৫০ ১৯৪৪ ও ৯৪৩৩০৭৫৫৫০
বিক্রয়কেন্দ্র পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯ ফোন ২২৪১ ১১৭৫
ই-মেল patrabharati@gmail.com ও kishorebharatipatrika@gmail.com
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (ডাকযোগে) ১৬০ টাকা

'পত্র ভারতী'র পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কল ৯ থেকে মুদ্রিত। ১০.০০

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
দ্যাখ! কাগজে খবর বেরিয়েছে কোথায় যেন রান্নাঘরে বাঘ ঢুকে পড়ে। তারপর বাড়ির লোক রান্নাঘরে ঢুকতেই অ্যাটাক করে।
দুন্দুভি
রান্নাঘরে বাঘ
কি সাংঘাতিক কাণ্ড গো, কেল্টুদা? লোকালয়ে তা আবার রান্নাঘরে বাঘ? যে ঢুকেছিলো তাকে খেয়ে ফেলেনি তো?
খেতে পারেনি, তবে আঁচড়ে কামড়ে নাকি গুরুতর জখম করে দিয়েছে।
আচ্ছা, কেল্টুদা! আমাদের রান্নাঘরে যদি ওরকম একটা বাঘ ঢুকে পড়ে?
আর পরে তুমি ঢুকলে, তাহলে কি হবে গো, কেল্টুদা?
হেঃ, হেঃ! আরে আমিও তো চাই আমাদের রান্নাঘরে বাঘ ঢুকুক তারপর ব্যাটা বাঘের কি হাল করি দেখবি। ছাল খুলে আবার সুন্দরবনে পাঠিয়ে দেবো।
কি সাংঘাতিক! জঙ্গলের বাঘ বাড়িতে এসে ঢুকছে! আসছিলো হাতি এবারে বাঘ। কখন এসে ঢুকে পড়বে ঠিক নেই। ছেলেদের সাবধান আর সতর্ক থাকতে বলি।
দুন্দুভি
রান্নাঘরে বাঘ
বিস্তারিত ভিতরে
এইযে, তোরা! শোন, সাবধানে থাকবি। ঘরে রান্নাঘরে বাঘ ঢুকে পড়ছে।
আমাদের বাঘের ভয় নেই স্যার। কেল্টুদাই বাঘের মহড়া নেবে।
বাঘ যদি কখনো আসেই কোন ভয় নেই স্যার। আমি আছি না?
বেশ, তাহলে তুইই ভরসা কেল্টু।
পরে-
এইযে, ভাই, নন্টে! বোর্ডিংয়ের রান্নাঘরে কি বাঘ ঢুকবে?
ঢুকতেই পারে, ভাই, ফন্টে।

পরদিন বিকেলে-
আমার বৈকালিক চায়ের সঙ্গে পাঁচটা ডিমের অমলেট করে দিও, ঠাকুর।
এখুনি নিয়ে আসছি, সাব।
রান্নাঘরে-
গর-র-র!
আরে বাপরে! শের!
বাপরে! কিচেনমে শের সুপারিটেন, সাব।
অ্যাঃ! ওরে কে আছিস, শিগগির কেল্টুকে ডাক।
কি-কি হয়েছে, স্যার?
যা ভয় করেছিলাম তাই হয়েছে। রান্নাঘরে কোত্থেকে বাঘ এসে ঢুকেছে। এখন তুই-ই ভরসা।
কোথায় বাঘ? আসুক না একবার আমার সামনে।
গর-র-র! গাঁক!
ইরক!
ওরে বাবারে! এযে সোঁদর বনের কেঁদো বাঘ।
তোর তো বাঘকে ধরার কথা, উল্টে তুই আমাকে এসে জাপটে ধরলি, হতচ্ছাড়া?
হায় রাম!
এদিকে-
অপারেশন বাঘ কেমন জমেছে রে নন্টে?
দারুণ! কেল্টার কেরামতি ধরা পড়ায় স্যার দারুণ ক্ষেপে আছে। তুই এই ডামাডোলে বেরিয়ে যা।
আমি রান্নাঘরে গিয়ে দেখে এলুম বাঘ নেই। হৈচৈ শুনে বোধহয় গা ঢাকা দিয়েছে।
বাঘে দরকার নেই। কেল্টু কোথায়, খুঁজে বের কর। তুরন্ত!
ওকে খুঁজে বের কর হাতে পেলে ওকে সোজা সোঁদর বনে বাঘেদের ডেরায় পাঠিয়ে দেবো।
ঠি-ঠিক আছে, স্যার। খুঁজে দেখছি।

তোমাদের কথা

চিঠি লেখো বা মেল করো : kishorebharatipatrika@gmail.com

নীলাঞ্জনা হাজরা
খড়্গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

নববর্ষের 'ভয় স্পেশাল' সংখ্যাটি এককথায় অনবদ্য। এরকম একটি সংখ্যা উপহার দেওয়ার জন্য জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

এই সংখ্যায় প্রায় প্রতিটি গল্পই কমবেশি ভালো। কয়েকটি খুবই ভালো। যেমন 'সবচেয়ে ভয়ের দিন', 'ডাকবাংলোতে সেই রাত', 'ওরা কারা', 'ছবি'। তবে সবচেয়ে ভালো লাগল 'সম্পাদকের সমস্যা' গল্পটি। অধিকাংশ গল্পেরই মাঝবরাবর পড়া হলে গল্পের শেষটা কী হবে, সেটা সম্পর্কে অনেকটা অনুমান করা যায়। কিন্তু 'সম্পাদকের সমস্যা' গল্পটির একেবারে শেষটা না পড়া পর্যন্ত কিছুতেই বোঝা যাচ্ছিল না যে, ব্যাপারটি কী হতে চলেছে। একেবারে অন্তিমে এসে রহস্য উন্মোচিত হল। এখানেই লেখকের দক্ষতা, গল্পের সার্থকতা।

নগেন্দ্র নারায়ণের কবিতা কখনওই ছাপার যোগ্য নয়। আমার এই চিঠি পাঠানোও ছাপার জন্য নয়। 'সম্পাদকের সমস্যা' গল্পটি আমায় মুগ্ধ করেছে এবং এরকম বুদ্ধিদীপ্ত লেখা আরও চাই—এটা জানানোর জন্যই এই চিঠি।

দীপালি সেন পঞ্চাননতলা, কল ৭৪

আমি কিশোর ভারতীর নিয়মিত পাঠিকা। এই জুন মাসের সংখ্যায় 'নাছোড়বান্দা ভূতের দল' বলে যে বিশ্বসাহিত্যের গল্পটি বেরিয়েছে, সেটি এককথায় অসাধারণ। 'কালাকে কালা, খোঁড়াকে খোঁড়া, ভূতকে ভূত বলতে নেই' এই চমৎকার তথ্যটি সত্যি জানা ছিল না। লেখার গুণে গল্পটি অনুবাদ নয়, একেবারে মৌলিক হয়ে উঠেছে। লেখককে আমার ধন্যবাদ জানাবেন। আপনি আমার নমস্কার নেবেন।

বন্ধুরা,
নতুন অনেক বন্ধু এবারে এসেছ। আরও সব্বাই এসো। মুসার অভিযোগের প্রতিকার চাই। গল্প আরও ভালো চাই।
ধ্রুব বাচস্পতি

রাজা মণ্ডল শিশু বিদ্যামন্দির হাইস্কুল, হাবড়া

আমি কিশোর ভারতীর একজন নিয়মিত পাঠক। আপনাদের জুন ২০০৮-এর সংখ্যাটি পড়লাম। পড়ে অনেক কিছু জানতে পারলাম তারাশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'বিপ্লবের সন্ধানে' জয়ন্ত ভট্টাচার্যের 'মঙ্গল অভিযানে উড়ন্ত রোবট' ও স্বপন বক্সীর 'আসনা সুন্দরপুর' পড়ে। চাই! চাই না! বিভাগটিও ভালো লাগছে। গল্প আরও ভালো চাই। এ সংখ্যায় সুব্রত ভট্টাচার্যের গল্পটি পড়ে ত্রিপুরা সম্পর্কে জানার ও দেখার আগ্রহ বেড়ে গেল। এ ছাড়া অন্যান্য গল্পগুলোও মোটামুটি লাগল। তবে অভিনন্দন রায়ের ডাকাত গল্পটি ঠিক-ঠিক লাগল না। আরও কিছু ভালো-ভালো গল্প কিশোর ভারতীতে পড়তে চাই।

নীলাঞ্জন ঘোষ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন, বারাকপুর

জুন মাসের কিশোর ভারতী খুব ভালো লেগেছে। সম্পাদকীয়তে বাবর আলির কথা পড়ে খুব আনন্দ পেলাম। ওঁর মানবিকতাবোধ দেখে খুব খুশি হলাম ও গ্রামের দুঃস্থ ছেলেদের নিয়ে স্কুল খুলেছে, ভাবা যায়! আমার মতে, বাবরদাকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। 'ডাকাত' পড়ে খুব দুঃখ পেলাম। সত্যি, মানুষের কি মানবিকতাবোধ নেই? ডাকাত বলেই ছেলেটাকে মারা হল। 'ছাগল নিয়ে টানাটানি' পড়ে খুব মজা পেয়েছি। 'বিশ্বসাহিত্যের গল্প' ও কমিকস্‌গুলো ভালো হয়েছে।

তুহিন চক্রবর্তী কুঁদঘাট, কলকাতা ৯৩

আমি নবম শ্রেণির ছাত্র এবং কিশোর ভারতীর নিয়মিত একজন পাঠক। কিশোর ভারতী তথা আমাদের সম্পাদকবন্ধুর কাছে দুটি আবেদন রেখেই এই চিঠির অবতারণা। প্রথমত, কিশোর ভারতীর একটি প্রচ্ছদ বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও সাহিত্য বিষয়ক প্রকাশিত হোক। দ্বিতীয়ত, নিধুখুড়োকে আবার কিশোর ভারতীর পাতায় দেখতে চাই।

সৈয়দ মহম্মদ মুসা সাহাবাজার, হুগলি-৭১২ ৪০২

বছরকয়েক আগে 'হরেকরকম'-এ 'পত্রমিতালি' নামে একটা বিভাগ ছিল। কিন্তু কোনও কারণ ছাড়াই কেন বিদায় নিল ওই দুর্দান্ত বিভাগটা তা আমার কাছে বোধগম্য নয়। হবি সহ বন্ধুদের নাম-ঠিকানা পেতাম, যার সাহায্যে পত্র বিনিময় করে বন্ধুত্ব পাতাতে পারতাম। কিন্তু সে পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ভীষণ মন খারাপ হচ্ছে। এ যুগে বন্ধুত্বের মূল্য যে কতখানি তা কোনও কিছু দিয়েই পরিমাপ করা যায় না। হোক না তা পত্রের মাধ্যমে। এ হেন অবস্থায় 'পত্রমিতালি'কে ফিরিয়ে এনে পাঠক/পাঠিকাদের মুখে হাসি ফোটান।

শরকৃষ্ণ চট্টসূর্য্য বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

জুন সংখ্যার কিশোর ভারতী পত্রিকায় আমাদের কথা পড়লাম। শিরোনাম 'কোনটা?' অসাধারণ সম্পাদকীয়। আমার মতে 'কোনটা'-র পরিবর্তে 'আই পি এল বনাম বাবর আলি' শিরোনাম হলে ঠিক হত। বাবর আলির জয় সুনিশ্চিত। সৎপরিশ্রম, সৎনিষ্ঠার মূল্য অনেকখানি।

ফিঙ্গার প্রিন্ট নিয়ে প্রচ্ছদ কাহিনি পড়লাম। ফিঙ্গার প্রিন্ট সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম। লেখককে অশেষ ধন্যবাদ। ছড়া-কবিতার পাতায় সোমনাথ চক্রবর্তী, স্বরাজ মুখোপাধ্যায়, প্রদীপচন্দ্র বসু, সুখেন্দু মজুমদারের ছড়া ভালো লেগেছে। তবে ধামাকা-র ছড়াকার প্রদীপচন্দ্র বসুকে জানাই আজকাল কলেজগুলোতে ধামাকা প্রোগ্রাম হচ্ছে জোরদার নবীনবরণ উৎসবকে ঘিরে। হাতের কাছে বিষ্ণুপুরে রামানন্দ মহাবিদ্যালয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আবার অশান্তি পাহাড়ে

প্রিয় বন্ধু,

আবার অশান্তি। এবার অশান্তি, বিক্ষোভ পাহাড়ে। আশির দশকে সুবাস ঘিসিং-এর নেতৃত্বে যে স্লোগান উঠেছিল, আবার সেই স্লোগান। গোর্খাল্যান্ড চাই। পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাহাড়কে আলাদা করে নতুন রাজ্য চাই।

কারা এই আন্দোলন করছেন? করছেন বিমল গুরুং নামের এক ধনী নেপালি যুবকের নেতৃত্বে 'গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা', যারা ক'দিন আগেও ছিলেন জি এন এল এফ সুপ্রিমো ঘিসিং-এর সঙ্গে।

গত প্রায় কুড়ি বছর ধরে সুবাস ঘিসিং 'গোর্খা পার্বত্য পরিষদ'-এর পাহাড়েশ্বর হয়ে বসে ছিলেন। দু-তিনটি দপ্তর ছাড়া পার্বত্য পরিষদ-এর হাতে ছিল অগাধ ক্ষমতা। দিনে-দিনে ক্ষমতা ও অর্থ বেড়েছে। রাজ্য সরকার গোর্খা পার্বত্য পরিষদ-এর কার্যকলাপে কখনও হস্তক্ষেপ করেননি।

তাহলে আবার গোর্খাল্যান্ড-এর ধ্বনি উঠছে কেন? আলাদা রাজ্য হলে কি রাতারাতি পাহাড়ে সোনা ফলবে? গোর্খাল্যান্ড-এর অর্থনৈতিক ভিত্তি কোথায়। শুধুই পর্যটন? কী পরিকল্পনা আছে বিমল গুরুংদের? কীভাবে গরিব গোর্খা, লেপচা, ভুটিয়া, চা-বাগানের শ্রমিকদের ভালো হবে?

বিমল গুরুংরা এতদিন ছিলেন ঘিসিং-এর অনুগত, বশংবদ। জি এন এল এফ-এর পাণ্ডা। এত বছরে তাঁদের কার্যকলাপ কী? কেন চেষ্টা করেননি পাহাড়ের উন্নতির জন্য? দলের মধ্যে থেকে তাঁরা ঘিসিং-এর দুর্নীতি, ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে সরব হননি কেন? নাকি প্রথমদিকে ভাগ পেতেন, পরে আর পেতেন না?

যুগ-যুগ ধরে পাহাড়ি মানুষ ও সমতলবাসীরা পাশাপাশি বাস করেছেন। আশির দশকের ধ্বংসাত্মক আন্দোলনে সেই সৌহার্দ্য সাময়িক আহত হলেও, আবার ফিরে এসেছিল। চা-বাগানে মালিকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তাঁরা কাঁধে-কাঁধ দিয়ে লড়াই করেছেন! আবার এই অশান্তিতে সেই ভালোবাসার সম্পর্ক নষ্ট হতে বসেছে।

আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ আজও বড় গরিব। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি তাদের জীবন আজ চরম অসহায়, অনিশ্চিত করে তুলেছে। তাদের একজোট করে যেখানে আন্দোলন সংগঠিত করার কথা, সেখানে গরিবে-গরিবে ভাগ করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এতে লাভ কাদের হচ্ছে?

এ কথাও অবশ্য বলতে হবে, সুবাস ঘিসিং বছরের-পর-বছর পাহাড়ের ক্ষমতায় থেকে কোটি-কোটি টাকা নয়ছয় করেছেন। এখন জানা যাচ্ছে, বহু দপ্তরের খরচের কোনও হিসাব নেই। উন্নয়নের জন্যে টাকা পড়ে আছে, খরচ হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেদিকে এতদিন নজর দেননি কেন? কেন কৈফিয়ত চাননি? সুবাস ঘিসিং আবার পাহাড়ে আগুন জ্বালবেন, সেই ভয়ে?

এভাবে রাজ্য ভাগ করে, গরিব মানুষদের লড়িয়ে দিয়ে কোনও সমস্যা মিটতে পারে না। বড়লোক বিমল গুরুংরা গরিব পাহাড়িদের প্রতিনিধি নন। তাদের দুঃখ-কষ্ট-অবহেলাকে উসকে দিয়ে নিজেরা বসতে চান ঘিসিং-এর চেয়ারে। তারপর ফের শুরু হবে আরও জোরকদমে লুঠপাট।

আমরা চাই প্রশাসনের সঠিক সদর্থক পদক্ষেপ। পাহাড়ি-সমতলবাসী সবাইকে নিয়ে সার্বিক উন্নয়নের কাজ করতে হবে। মায়াময় সবুজ প্রকৃতি, বরফে ঢাকা হিমালয়ের প্রশান্তির মাঝে, চা-বাগানকে ঘিরে গড়ে উঠুক সত্যিকারের পর্যটনের পরিকাঠামো। গড়ে উঠুক নানাবিধ ফুল-ফল প্রসেসিং শিল্প। ব্যাপক কাজের সুযোগ পান গরিব পাহাড়ি মানুষেরা। তাঁদের মুখে স্বস্তির আলো ফুটুক।

আজ এই পর্যন্ত। তোমরা সকলে ভালো থেকো। আমাদের প্রাণভরা শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা নিও। ইতি—

তোমাদের

সম্পাদক বন্ধু

তোমাদের দপ্তর

বাজে খরচ

আমি ছোটবেলায় জ্যেঠতুতো-খুড়তুতো ভাইবোনদের সঙ্গে বড় হয়েছি—মানে আমাদের ছিল একান্নবর্তী পরিবার। ভাইবোনদের মধ্যে আমাকেই বাড়ির বড়রা বেশি ভালোবাসত। কারণ, আমিই ভাই-বোনদের মধ্যে পড়াশোনায় বেশ ভালো ছিলাম। আমাকে সবাই ভালোবাসত—তাই সেই সুবাদে আমি বাড়ির বড়দের কাছ থেকে প্রত্যেক মাসে মোটা টাকা হাতখরচ হিসাবে আবদার করতাম। আর সেই টাকা দিয়ে এটা-ওটা কিনে, কখনও বা অন্যভাবে খরচ করতাম।

কিন্তু আমার বাবার কাছে আমার এইভাবে টাকা খরচ করাটা একদম বাজে খরচ। এর জন্য বাবার কাছে তখন কম বকা খাইনি। বাবা বলত,—পয়সা যে কী জিনিস তা একদিন বুঝবি।

আমরা ভাইবোনেরা দল বেঁধে ছুটির দিনে বাড়ি থেকে দূরবর্তী কোনওস্থানে পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করতে বের হতাম। এটা ছিল আমাদের কাছে এক বিরাট নেশা। এই নেশার জন্য চেনাজানা সবার কাছে আমাদের কম হাসির খোরাক হতে হয়নি। যাইহোক, আমি ছাড়া অন্য কোনও ভাইবোন হাত খরচ পেত না। তাই আমাকেই ওইদিন সবাইকে খাওয়াতে হত ওরা যা খেতে চাইত।

সেদিন এই রকমই এক ছুটির দিনে আমরা সবাই দল বেঁধে বেড়িয়েছি। বেশ অনেকটা যাওয়ার পর দুর্ভাগ্যবশত আমার ডান-পা খানা একটা গর্তের মধ্যে পড়ে যায়। এবং তার ফলে আমি আর হাঁটতেই পারছিলাম না। আমার এই অবস্থা দেখে আমার অন্যান্য ভাইবোনেরা হইহই করে উঠল। ওদের মুখে তখন একটাই প্রশ্ন, 'এখন কী হবে!'

আমি তখন বললাম, 'চল বাড়ি ফিরে যাই!'

এরপর বাড়িতে ফেরার বাসে উঠতে-না-উঠতেই কনডাক্টার টিকিট চাইতে শুরু করল। আমি তখন টিকিট কাটার জন্য প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকালাম। মানিব্যাগটা বার করার জন্য। কিন্তু কোথায় মানিব্যাগ। আমার তখন মনে পড়ল, আরে মানিব্যাগটা তো বালিশের তলায় রেখে এসেছি! আমি তখন কনডাক্টারকে সব কথা বললাম। কনডাক্টার আমার কোনও কথা না শুনে আমাদের সবাইকে নামিয়ে দিল।

আমি তখন কী করি তাই ভাবছিলাম। এমনসময় আমার এক খুড়তুতো ভাই অমিত বলল, 'আচ্ছা, পথযাত্রীদের কাছে বাস ভাড়ার পয়সা চাইলে হয় না?'

অন্যান্যরা বলল, 'কী যা-তা বকছিস!'

আমি বললাম, 'এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।'

আমি তখন পথযাত্রীদের যাদেরই সামনে পাই তাকেই সব কথা খুলে বলে পয়সা চাইতে লাগলাম। কিন্তু কেউই পাত্তা দিল না। তখন আমার চোখ ছলছল করে উঠল। এখন কী করব এই ভেবে। আর তখন আমার বাবার সেই কথাটাই বারবার মনে ঘোরাফেরা করতে লাগল, 'পয়সা যে কী জিনিস তা একদিন বুঝবি।' আমি তখন বাবাকে মনে-মনে বললাম, 'বুঝেছি বাবা, বুঝেছি! তুমি কেন যে আমাকে বলতে পয়সা কী জিনিস তা একদিন বুঝবি—তা আমি আজকে বুঝেছি।'

আর তখনই আমি ঠিক করলাম, আর কোনওদিন পয়সাকে বাজে খরচ করব না।

ঠিক সেই সময়ই আমাদের চোখের সামনে দিয়ে একটা ট্যাক্সি বেরিয়ে গেল। ট্যাক্সিটা দেখে আমি মনে-মনে ভাবলাম, আরে ট্যাক্সি করে বাড়ি গেলে হয় না! ট্যাক্সিতে তো আর বাসের মতো ওঠামাত্রই টাকা দিতে হয় না—বাড়ি গিয়ে ধীরেসুস্থে ভাড়ার টাকাটা দিলেই হয়।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। একটা ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ফিরে ভাড়ার টাকাটা দিয়ে দিলাম।

অভিজিৎ দাস, বিধান শিশু সরণি, পুলিশ হাউসিং কমপ্লেক্স, কলকাতা ৫৪

দুই বন্ধু

পরীক্ষাতে ডিগবাজি খেয়ে নুটু রায়
পৃথিবীটা ঘুরছেই টের পেল তায়।
সত্যিই রোগ অসুখ কোনোকিছু নাই,
মাথা তবু ঘুরছেই কারণ সেটাই।
ভূগোলেতে গোল পেয়ে জেনেছে এ-ও
পৃথিবী যে গোলাকার নেই সন্দেহ।
ভূগোলটা জানতেই পাড়ি দেবে সে,
মাথায় চড়েছে জিদ, আটকায় কে?
পড়াশুনা ছাড়বে না তবে এটা ঠিক
পাড়ি দিতে চাই তাই মোটরবাইক।

পূরবী ভারতী আমদহি, বাঁকুড়া-৭২২ ১৪১

নোলা

শাজাহানের দোকানে
ঢুকে পড়ে গোপনে
সিরাজের ভাইপো
খেয়েছিল মালপো
দেখেছিল ভাইজান
করেছিল পাঁচকান।
ধরা পড়ে অবশেষে
বলেছিল ঝেড়েকেশে
নোলাটা বড়বেশি
করছিল উসখুশি
লোভে পড়ে তাই
সাবড়েছি ভাই।।

তাপস বাগ গোকুল বড়াল স্ট্রিট, কলকাতা ১২

স্ব প ন ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

ডাকাত! ডাকাত!

প্রচ্ছদকাহিনি

ডাকাত বলতেই কি সাধারণ ভাবে এমন কিছু মানুষের কথাই আমাদের মনের মধ্যে ভেসে ওঠে, যাদের দেহ প্রকাণ্ড, ভাঁটার মতো চোখ, নাকের নীচে পাকানো গোঁফ আর হাতে পাকা তেল চুকচুকে লাঠি! যারা নিশীথ রাতে 'হারে রে রে রে রে' হুঙ্কার তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে গৃহস্থের ওপরে।

'হারে...রে রে...রে রে...'

"হাতে লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল-
কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল"

আচ্ছা, ডাকাত বলতেই কি সাধারণ ভাবে এমন কিছু মানুষের কথাই আমাদের মনের মধ্যে ভেসে ওঠে, যাদের দেহ প্রকাণ্ড, ভাঁটার মতো চোখ, নাকের নীচে পাকানো গোঁফ আর হাতে পাকা তেল চুকচুকে লাঠি! যারা নিশীথ রাতে 'হারে রে রে রে রে' হুঙ্কার তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে গৃহস্থের ওপরে। তাদের যথাসর্বস্ব লুঠ করে, খুন করতেও পেছপা হয় না।

এমন সব চরিত্র নিয়ে আমাদের বাংলা সাহিত্যে রচিত হয়েছে কত বিচিত্র রোমহর্ষক সব ডাকাতির গল্প।

বাস্তব কিন্তু ঠিক এমনটি নয়।

চোর-ডাকাত-দস্যু-লুঠেরা...! অপরাধ দুনিয়ার ভিন্ন-ভিন্ন প্রজাতি। ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারাও এদের জন্যে আলাদা-আলাদা। তবে চোর (মূল শব্দ চতুরালি)-এর সঙ্গে ডাকাত বা লুঠেরাদের একটা

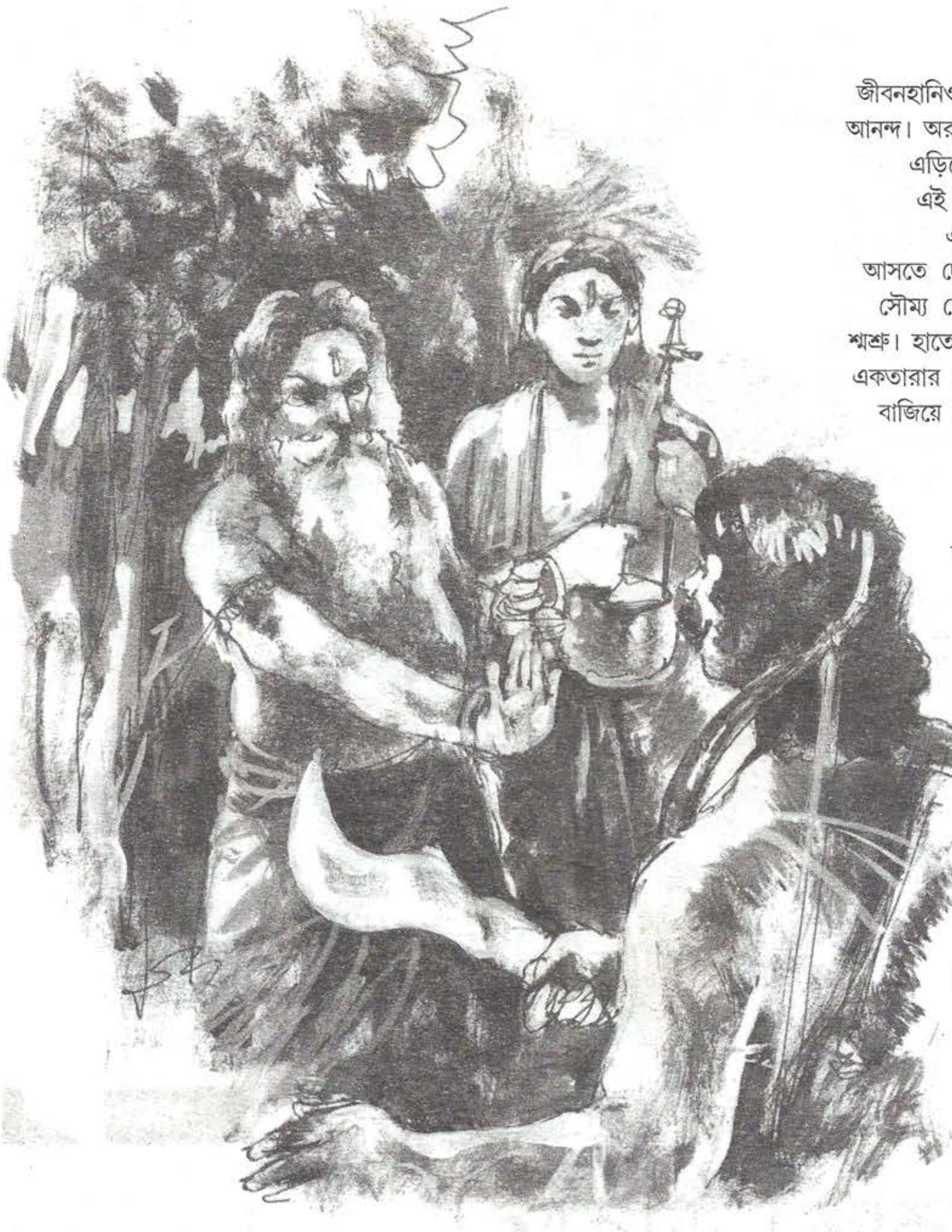

প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। চুরি ব্যাপারটা হয় লুকিয়ে-চুরিয়ে, কখনও চাতুর্যের দ্বারা কায়দা করে। এদের সঙ্গে ডাকাত-দস্যু-লুঠেরাদের অপরাধ কর্ম একেবারেই মেলে না। ডাকাত-দস্যুরা বলপূর্বক অন্যের সম্পত্তি বা জীবনহরণ করে। অনেক সময় সম্পত্তিহরণ ছাড়া অন্য কারণও থাকে ডাকাতির পেছনে।

কী সেই কারণ? ডাকাতের সম্পর্কে বরাবরই মানুষের অপ্রতিরোধ্য কৌতূহল।

তবে সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমরা বরং একটু অতীতচারী হই। যুগ-যুগ ধরে ঘটে যাওয়া কিছু ব্যতিক্রমী ডাকাতির কথা তুলে ধরতে চেষ্টা করি।

খ্রিস্ট পূর্বকাল

(তমসার তীরবর্তী ঘন জঙ্গল)

তীব্র খরস্রোতা নদী তমসা বয়ে চলেছে। দু-পাশে শাল-শিমূল-বট-অশ্বত্থের ঘন অরণ্য। দিনমানেও ছায়াচ্ছন্ন।

এই জঙ্গলে হিংস্র পশুদের সঙ্গে বাস করে এক অরণ্যচারী দস্যু। আকার তার ভীষণ। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। হাতে ধারালো খড়্গা। পিঠে তিরধনুক। কোনও পথিক বা তীর্থযাত্রীর দল জঙ্গলের পথে পা রাখলে দিন দুপুরেও তাদের নিস্তার নেই। এই ডাকাত তাদের সর্বস্য কেড়ে নেয়। জীবনহানিও ঘটে। হত্যা করতেই তার আনন্দ। অরণ্যের হিংস্র শ্বাপদরাও ভয়ে এড়িয়ে চলে এই নির্মম দস্যুকে। এই ভাবেই দিন কাটছিল তার।

একদিন জঙ্গলের পথে হেঁটে আসতে দেখা গেল দুই বৃদ্ধকে। শান্ত সৌম্য চেহারা। একজনের মুখে দীর্ঘ শ্মশ্রু। হাতে কমণ্ডলু। অন্যজনের হাতে একতারার মতো একটা যন্ত্র। সেই যন্ত্র বাজিয়ে তিনি ঈষ্টদেবতার নাম গান করে চলেছেন।

সেই গানের সুর পৌঁছে গেল অরণ্যচারী দস্যুর কানে। সঙ্গে-সঙ্গে সে ধারালো খড়্গা বাগিয়ে এল শিকারের সন্ধানে। দুই সন্ন্যাসীকে দেখেও নিবৃত্ত হল না। আর কিছু না হোক, ওদের কাছ থেকে তো ওই ধাতব কমণ্ডলু আর বাদ্যযন্ত্রটা কেড়ে নেওয়া যাবে!

হিংস্র উল্লাসে সেই দস্যু তার ধারালো খড়্গা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম করল দুই সন্ন্যাসীর ওপর।

কিন্তু তার আগেই প্রথম সন্ন্যাসী চকিতে ডান হাত তুলে আদেশ করেন

—তিষ্ঠ!

থমকে গেল সেই দস্যু। চেষ্টা করেও হাতের খড়্গা সে নামিয়ে আনতে পারল না শিকারের শরীরে। সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর দু-চোখের দিকে তাকিয়ে দস্যুর শরীরটা কেমন যেন শিথিল হয়ে পড়ল। নিজের ইচ্ছায় একটুও নড়ার ক্ষমতা রইল না। ওই সন্ন্যাসী কি জাদু জানেন!

—এ পাপ তুমি কেন করছ? চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী।

—তুমি জানো না, অকারণে প্রাণী হত্যা করা অপরাধ? পাশ থেকে বললেন অন্যজন।

—পাপ! এবার যেন নিজের অজান্তেই ধীরে-ধীরে উচ্চারণ করল সেই দস্যু,—পাপ

কীসের? এটাই তো আমার জীবিকা। এভাবেই আমি আমার মাতা-পিতা-স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভরনপোষণ করি। অন্য কোনও জীবিকার সন্ধান তো আমার জানা নেই।

এবার মৃদু হাসলেন সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী,—তবু এ পাপ। যাদের জন্য তুমি এ-কাজ করছ তারা কি তোমার এ-কর্মের দায় গ্রহণ করবে? পাপের অংশীদার হবে!

—নিশ্চয়ই! দস্যু বলল, আমার কর্মের ফল যখন তারা ভোগ করছে, দায়ও নিশ্চয়ই তারা গ্রহণ করবে।

—বেশ তো, জিগ্যেস করে এসো তোমার এ বিশ্বাস সঠিক কি না।

সঙ্গী সন্ন্যাসী বললেন, —না হয় আমাদের এই গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে যাও। যাতে আমরা পালাতে না পারি।

কী ভেবে দস্যু রাজি হয়ে গেল। সম্ভবত এই সন্ন্যাসীদের জাদুকরি ব্যক্তিত্বের কাছে হার মেনে।

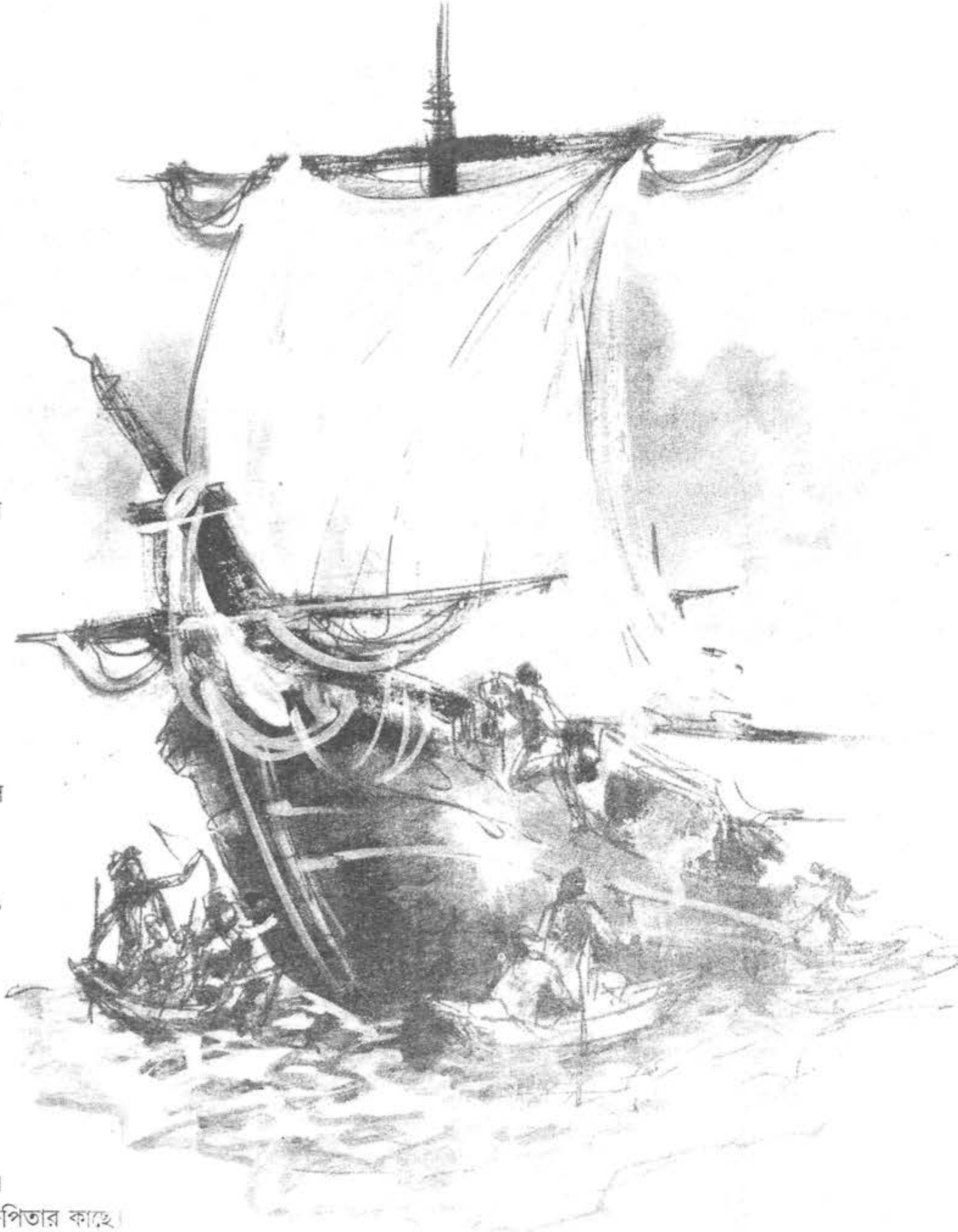

সে প্রথমে গেল মাতা-পিতার কাছে। পুত্রের সব কথা শুনে তাঁরা বললেন,—আমরা বৃদ্ধ হয়েছি। সন্তান হিসেবে তোমার কর্তব্য আমাদের আহার-আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। তাই বলে তোমার পাপ কর্মের দায় আমরা নিতে পারি না।

স্ত্রী-ও বলল,—আমায় বিয়ে করেছ তুমি। তোমার কর্তব্য আমার ভরনপোষণ চালানো। তোমার পাপের দায় আমি কেন বহন করব?

সন্তানেরাও একই যুক্তি দিল। সন্তানের ভরনপোষণের দায়িত্ব পিতার, যতদিন না তারা সাবালক হয়ে ওঠে। তাই এসময়ে পিতা বিপথগামী হলে সে দায় সন্তানের ওপর বর্তায় না।

শুনতে-শুনতে জীবনের এক মহাসত্যের মুখোমুখি হল এই দস্যু। সে বুঝল এই দুই সন্ন্যাসী তাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। সে তখন ছুটে এসে সন্ন্যাসীদের বন্ধনমুক্ত করে তাদের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

এর পর সন্ন্যাসীরা তাকে জীবনের নতুন পথের সন্ধান দিলেন। দীর্ঘ সাধনার পর সিদ্ধ হলেন এই দস্যু।

দস্যু রত্নাকর হলেন মহর্ষি বাল্মীকি। রচনা করলেন অমর মহাকাব্য রামায়ণ।

এক জাতি পরিচয়হীন অত্যন্ত নিম্নবর্গের ডাকাত পরবর্তী জীবনে হলেন ভারত ইতিহাসের সবচেয়ে বড় কবি।

—এমন দৃষ্টান্ত বোধকরি পৃথিবীর আর কোনও দেশের পুরাণ ইতিহাসে নেই। কিন্তু এটাই প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রাণ-ধর্ম।

অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগ

(ভারত সন্নিহিত আরব সাগর)

ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক বরাবর পাল তুলে ভেসে চলেছে সুসজ্জিত এক বৃহদাকৃতি জাহাজ। দাঁড় টানছে একশো দাঁড়ি। জাহাজটি আসছে সুদুর সিংহল দ্বীপ থেকে। সেখানকার রাজা, আরবের খলিফা এবং ইরাকি প্রতিনিধি

আলহাজ্জাজকে এই জাহাজে করে পাঠাচ্ছেন বহুমূল্যবান উপহার সামগ্রী।

জাহাজ তখন দেবল বন্দরের (বর্তমান পাকিস্তানের করাচি শহর) কিছুদূর দিয়ে চলেছে। দিনের আলো নিভে আসছে। নেমে আসছে অন্ধকার।

হঠাৎ তুমুল চিৎকার, হইচই। চারদিক থেকে ছুটে এসে জাহাজটাকে ঘিরে ফেলেছে গোটা কয়েক দ্রুত গতিসম্পন্ন ছিপ। প্রতিটি ছিপে ভয়ঙ্কর চেহারার সব মানুষ। ওদের পিঠে তিরধনু, হাতে তলোয়ার। কারুর হাতে মশাল।

ওরা একযোগে আক্রমণ হানল জাহাজটার ওপর। রক্তের স্রোত বইয়ে লুঠ করল যাবতীয় সম্পদ। তারপর জাহাজটাকে ডুবিয়ে দিল সমুদ্রের গভীরে।

জলদস্যুদের আক্রমণে সে জাহাজের অধিকাংশই যাত্রীরই সেদিন মাঝ সমুদ্রে সলিল-সমাধি ঘটল। কয়েকজন বেঁচে গিয়ে কোনওক্রমে পৌঁছে গেল সাগরতীরে। তারপর সোজা ইরাকের শাসক আল হাজ্জাজের দরবারে পৌঁছে জানাল নিজেদের দুরবস্থার কথা।

শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হলেন ইরাকের খলিফার প্রতিনিধি। তক্ষুণি দূত পাঠালেন পশ্চিম ভারতে সিন্ধু রাজ্যের রাজা দাহিরের রাজসভায়। বলে পাঠালেন—জলদি যেন সেই জলদস্যুদের ধরে বেঁধে হাজ্জাজের কাছে পাঠানো হয়।

কিন্তু এ-কাজ কি এতই সহজ? সমগ্র আরব সাগরে সেসময়ে যেমন বিভিন্ন দেশের বণিকদের বাণিজ্য তরী ঘুরে বেড়াচ্ছে, তেমনি যখন-তখন সেখানে জলদস্যুদের উপদ্রব। তারা যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি নির্মম। তাদের ধরে বেঁধে আনার মুরোদ রাজার নৌবাহিনীর নেই। আসলে এই জল-ডাকাতরা যেমন ধূর্ত, তেমনি ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন ছিপে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। রাজার রণতরী দূর থেকে দেখলেই পিটটান দেয়।

কিন্তু এসব কোনও অজুহাতেই কান দিলেন না আল হাজ্জাজ। দাহিরের বিরুদ্ধে বিশাল সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। আসলে কারণটা ছিল অন্য—নতুন ইসলাম ধর্মে দীঘিত মানুষরা তখন চাইছে তাদের রাজ্য এবং ধর্মের সীমারেখা বিস্তার করতে।

প্রথমটা সুবিধে করতে পারেনি ইরাকি সেনাদল। কিন্তু হেরেও তারা হাল ছাড়ল না। আবার ধেয়ে এল বন্যার মতো বেগে। অবশেষে দাহির পরাজিত হলেন। ভারতে মুসলমান রাজশক্তির প্রথম পদক্ষেপ ঘটল।

প্রথম উপলক্ষ কিন্তু সেই জলদুস্যরা। ভারত সন্নিহিত সমুদ্রের বুকে তাদের লুঠপাটের পরিণতিই ভারতের বুকে ডেকে এনেছিল বিদেশি সেনাদের।

সপ্তদশ শতাব্দী

(বাংলার সরস্বতী নদীর তীরবর্তী সপ্তগ্রাম)

পবিত্র মহালয়া তিথিতে পুণ্য স্নানে নেমেছিল নারী-পুরুষের দল। কয়েকটি শিশুও ছিল।

পিতৃহারা পুরুষেরা নদীতে নেমে পিতৃতর্পণ করছিলেন। একটু দূরে অন্যঘাটে নারী ও শিশুরা স্নান করছে। নদীতীরে আশ্বিনের কাশফুল দুলছে। দিনকয়েক পরেই বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব—দুর্গা পুজো। এ সময়ে সকলেরই মন আনন্দে ভরপুর।

হঠাৎ ও কী! দূর থেকে ছুটে আসছে কয়েকটি ছিপ নৌকো। তবে আকারে বেশ বড়। আর চালক বা আরোহীরা কেউ এদেশি মানুষ নয়—শ্বেতাঙ্গ। পরনে বিদেশি পোশাক। মাথায় টুপি। কোমরে তলোয়ার। হাতে বন্দুক।

—হার্মাদ! হার্মাদ!

একটা ভয়ার্ত চিৎকার উঠল নদীর ঘাটে। একটু আগের শান্তপরিবেশ মুহূর্তে পালটে গেল। যে যেভাবে পারল পালাতে শুরু করল।

কিন্তু হার্মাদদের ছিপগুলো ততক্ষণ পৌঁছে গেছে নদীর ঘাটের কাছাকাছি। যারা তখনও পালাতে পারেনি তাদের জোর-জবরদস্তি টেনে তুলতে শুরু করেছে তাদের নৌকায়। এর মধ্যেও যারা পালাবার চেষ্টা করছে, তাদের গুলি করে হত্যা করছে।

কান্নাকাটি! হইচই!

কিন্তু কিছুই নিরস্ত করতে পারল না সেই হার্মাদদের। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা এক ঝাঁক নারী-পুরুষ শিশুকে বন্দি করে তাদের দ্রুতগামী ছিপ নৌকোয় তুলে নিমেষে ছুটে চলে গেল দৃষ্টি সীমার বাইরে।

এরা ছিল ষোড়শো শতাব্দীর বাংলার জল-ডাকাত। পর্তুগিজ হার্মাদ। এরা সুদূর পর্তুগাল থেকে এদেশে এসেছিল বাণিজ্য করতে। কিন্তু শেষপর্যন্ত দস্যুগিরির সহজ রাস্তাটাই বেছে নিল। তারা বাংলার গ্রামগঞ্জ থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে মানুষ তুলে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত দেশ-বিদেশের দাস-বাজারে।

এই পর্তুগিজ হার্মাদদের অত্যাচার চলেছিল সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত—যতদিন না বাংলার হুগলিতে তাদের মূল ঘাঁটিটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এভাবে তাদের মূল শক্তিকেন্দ্রে আঘাত করে তাদের বাংলা ছাড়া করেছিলেন মুঘল সম্রাট শাহজাহান।

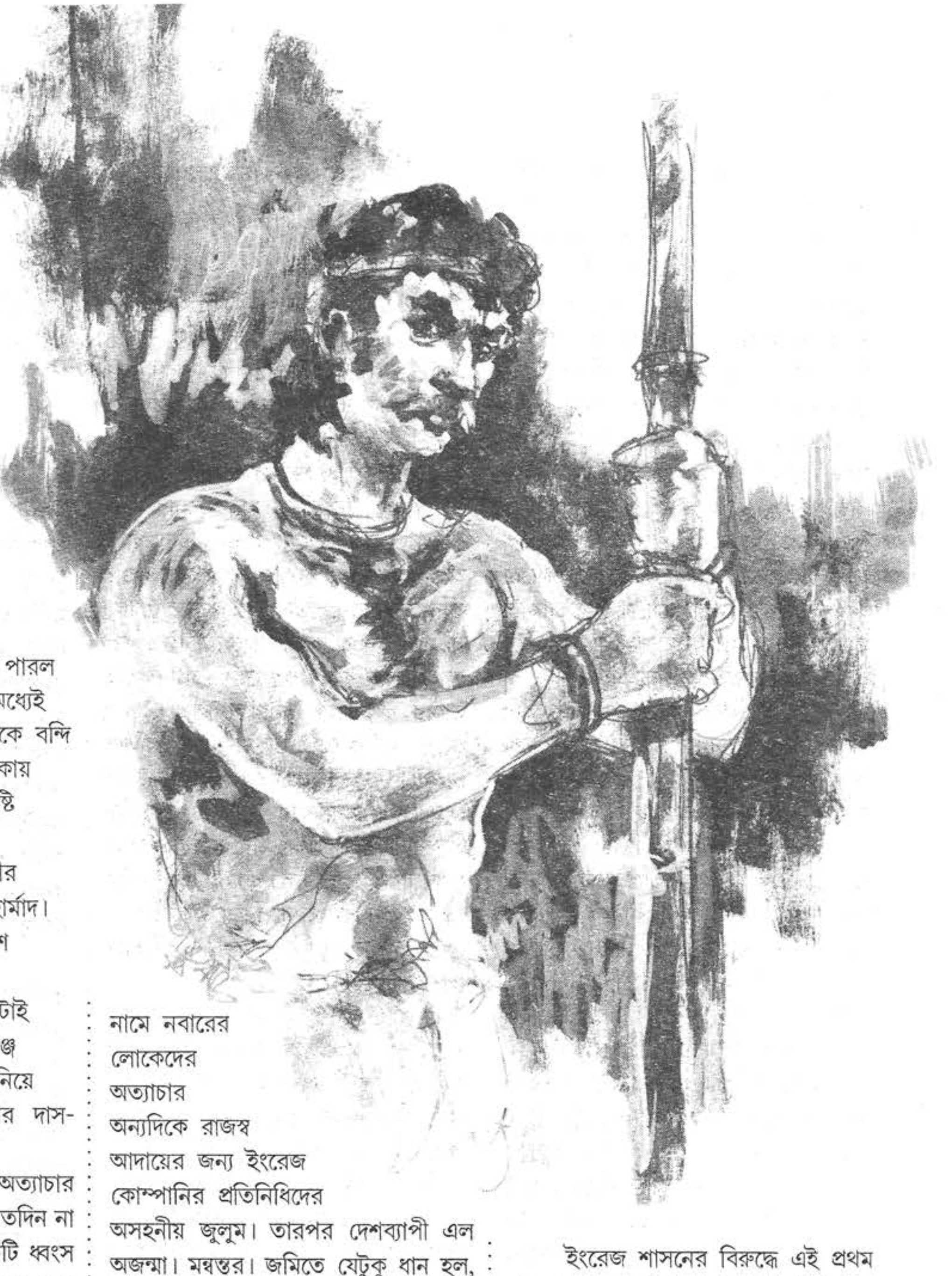

অষ্টাদশ শতাব্দী

(পলাশির যুদ্ধ-পরবর্তী বাংলা)

পলাশির যুদ্ধের বেশ কয়েক বছর পর। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন তখন এদেশে ক্রমশ জাঁকিয়ে বসছে। বাংলায় চলছে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা। দেশ শাসনের ভার বাংলার পুতুল-নবাবের হাতে, আর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে—একদিকে শাসনের নামে নবাবের লোকেদের অত্যাচার অন্যদিকে রাজস্ব আদায়ের জন্য ইংরেজ কোম্পানির প্রতিনিধিদের অসহনীয় জুলুম। তারপর দেশব্যাপী এল অজন্মা। মন্বন্তর। জমিতে যেটুকু ধান হল, নবাব এবং কোম্পানির রাজস্ব আদায়কারীরা তা-ও এসে কেড়ে নিয়ে গেল। দিকে-দিকে নিরন্ন চাষি-পরিবার। বাঁচার আকুতিতে প্রথমে গরু-বলদ বেচল, লাঙল বেচল, তারপর ভিটেমাটি ছেড়ে সপরিবারে চলল খাদ্যের সন্ধানে। কিন্তু কোথায় খাবার? একমুঠো ভাতের জন্য চাষি এবার তার পুত্র-কন্যা-স্ত্রী সব বেচল। তবু প্রাণ বাঁচে না।

অবশেষে তারা বিদ্রোহী হল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল কর্মহারা সৈনিক, জমিদার, ভবঘুরে ফকির সন্ন্যাসীর দল। তারা সবাই মিলে অস্ত্র তুলে নিল ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে।

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এই প্রথম বাংলার সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ। ইতিহাসে এই বিদ্রোহকে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ বলা হয়েছে। ইংরেজ শাসককুল অবশ্য এদের বলত ডাকাত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেবী চৌধুরানি বা আনন্দমঠ উপন্যাসে এই তথাকথিত সন্ন্যাসী ডাকাতদের কথা লেখা হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ

(উত্তর ও মধ্য ভারত)

ভারতে ইংরেজ অধিকারের আগে থেকেই বিশেষ করে উত্তর আর মধ্য ভারত জুড়ে ছিল ঠগি-ডাকাতদের উপদ্রব।

অদ্ভুত ছিল এই ডাকাতদলের ডাকাতির কৌশল। এরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়াত নিরীহ তীর্থযাত্রী বা ভ্রমণকারীর ছদ্মবেশে। পথে কোনও উপযুক্ত 'শিকার' বা অসহায় যাত্রীর সঙ্গে পরিচিত হলে তাকে বা তাদের পথের নিরাপত্তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে সঙ্গে নিত। তারপর সুবিধে মতো কোনও নির্জন স্থানে তাঁবু ফেলে গান-বাজনা বা নাচের আসর বসাত। সে আসরে 'শিকার' যখন নাচ-গানে মজে থাকত বা কথাবার্তায় ব্যস্ত থাকত, হঠাৎ দলপতি চেঁচিয়ে উঠত 'পান লাও' বা 'তামাকু লাও'। এটাই ছিল হত্যা সংকেত। সঙ্গে-সঙ্গে সেই শিকারের পেছনে ঘাপটি মেরে বসে থাকা হত্যাকারী তার গলায় রুমাল বা বস্ত্রখণ্ডের ফাঁস দিয়ে চকিতে খুন করত। ঠগিরা এই রুমাল বা বস্ত্রখণ্ড ছাড়া অন্য কোনও অস্ত্র ব্যবহার করত না। এ সময়ে উত্তর এবং মধ্য ভারতের অসংখ্য পথিক পথে ঠগিদের কবলে পড়ে নিহত হয়েছে।

অত্যন্ত সংগঠিত ছিল এই ঠগি ডাকাতের দল। এদের কাজের নানা ভাগ ছিল। কারুর কাজ ছিল শিকারকে বশ করে দলের সঙ্গে যেতে রাজি করানো, কোনও বিভাগে ছিল নৃত্যগীত পটিয়সী নারী-পুরুষদের দল, তৃতীয় বিভাগে ছিল জনাকয়েক দক্ষ ফাঁসুড়ে—যারা গলায় রুমাল দিয়ে একটানে শিকারের ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারে। শুধু তাই নয়, শিকারকে হত্যা করে তাকে কবরস্থ করার জন্যে আলাদা সদস্য ছিল। তাদের কাজ ছিল আগে থেকেই জঙ্গল বা নির্জন কোনও স্থানে কবর খুঁড়ে রাখা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই নিহত মানুষটার খোঁজ কেউ কোনওদিন পেত না।

বহু শতাব্দী যাবৎ এই দুর্ধর্ষ ঠগি ডাকাতের দল তাদের এই ভয়ঙ্কর অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের দমন করা কারুর পক্ষেই সম্ভব হচ্ছিল না।

অবশেষে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতের ইংরেজ গর্ভনর লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসন কালে এই ডাকাত দলের দৌরাত্ম চরম সীমায় পৌঁছলে তিনি কর্নেল স্লিম্যানের ওপর দায়িত্ব দিয়ে এ-ব্যাপারে একটি প্রশাসনিক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং কর্নেল স্লিম্যানের দীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলেই অবশেষে এই দুর্ধর্ষ ঠগি-ডাকাতদের দৌরাত্ম রোধ করা সম্ভব হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ

(কোম্পানি শাসনে বাংলা)

শতাব্দীব্যাপী বিদেশি কোম্পানি শাসনে বিপর্যস্ত তখন বাংলার অর্থনীতি। অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলা সারা নগর-গ্রাম জুড়ে। সেইসঙ্গে অত্যাচারী জমিদার জোতদার শ্রেণি আর নীলকর সাহেবদের অবর্ণনীয় অত্যাচারে দিকে-দিকে প্রান্তিক চাষি আর উপজাতি সম্প্রদায় হারাচ্ছে তাদের জমির অধিকার! এই বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষগুলোর মধ্যে জেগে উঠল বিদ্রোহের আগুন। তারা হাতে অস্ত্র তুলে নিল, ইংরেজ শাসকের ভাণ্ডার আর জমিদার-জোতদারদের ধানের গোলা লুঠ করতে শুরু করল। তাদের চিহ্নিত করা হল 'ডাকাত' বলে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের কাজ ছিল ধনীর দৌলত, ধানের গোলা লুঠ ক রে গরিবের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া। যে ঘটনা এককালে ঘটেছিল ইংল্যান্ডে। সেখানকার শেড়উড বনভূমির দস্যু রবিন হুড। অর্থাৎ এরাও ছিল বাংলার সেই রবিন হুডের দল। এমনই এক 'রবিন হুড' ছিল বিশ্বনাথ বা বিশে ডাকাত।

তার সম্পর্কে নদীয়া জেলার ইতিহাসে লেখা আছে ঃ

"বিশ্বনাথ জাতিতে এবং ব্যাবসায়ে ততোধিক হীন হইলেও তাহার উদার চরিত্র ও বীরোচিত সুন্দর গঠন এবং ভদ্রোচিত দান-শৌণ্ডকতার জন্য তাহাকে 'বাবু' আখ্যাদান করা হইয়াছিল। কথিত আছে, তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—দরিদ্র ও অসহায় প্রজাকুলকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা করা। বিশ্বনাথ কৃপণ ধনীর যম ছিল। ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণের ধনে দরিদ্র-পোষণ তাহার বড় আনন্দের কার্য ছিল। বিশ্বনাথ কত কন্যা দায়গ্রস্ত দরিদ্রের বিবাহের ব্যয় বহন করিয়াছে, কত অসহায় পরিবারের সংসার প্রতিপালন করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।"

বিশ্বনাথের জীবনীকার শ্রীবিমলেন্দু কয়াল বিশ্বনাথ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"দস্যুর আখ্যাতি-আখ্যায় তাঁহার খ্যাতির কাহিনি আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। শেরউড বনভূমির দস্যু রবিন হুড যে ইংরেজদের জাতীয় জীবনে মহিমায় মহিমান্বিত হইয়াছেন, সেই ইংরেজ ব্রাহ্মণীতলার বনভূমির বাঙালি বীরকে 'দস্যু' আখ্যায় আখ্যাত করিয়া হীনভাবে হত্যা করিয়াছে।"

বিশে ডাকাতের মতন ডাকাত বাংলায় আরও অনেক ছিল। এদের মধ্যে আর-একটি স্মরণীয় নাম 'রঘু ডাকাত'। তাকে নিয়েও প্রচলিত ছিল অনেক চমকপ্রদ কাহিনি।

বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা পূর্ববর্তী আমল

(বাংলার স্বদেশি যুগ)

১৯০৫ সাল। ভারতের ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনিক সুবিধার অজুহাতে বাংলাকে দু-টুকরো করে দিল। আসল উদ্দেশ্য বাংলার স্বাধীনতাকামী মানুষের ঐক্য বিনষ্ট করা। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ হলেও সেদিন বাঙালির হৃদয়ভঙ্গ হয়নি। সে সর্বশক্তি নিয়ে প্রতিবাদ জানাল বিদেশি শাসকের এই অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে। দেশব্যাপী গড়ে উঠল বৈপ্লবিক সংগঠন। যুগান্তর দল এবং অনুশীলন সমিতি দিকে-দিকে বাংলার জাতীয়তাবাদী যুব সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে বিদেশি সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানার পরিকল্পনা গড়ে তুলল।

বিপ্লবী কর্মধারার প্রাথমিক পর্যায়ের কার্যক্রম ছিল বাংলার জনগণকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা এবং অত্যাচারী শাসককুলকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলা। বিপ্লবীদের এই কর্মকাণ্ডকে ইংরেজ শাসক-শ্রেণি 'সন্ত্রাসবাদ' এবং এইসব বিপ্লবীদের 'স্বদেশি ডাকাত' বলে প্রচার করেছে। তবে একথা ঠিক, বিপ্লবীরা তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে অত্যাচারী শাসককুলকে হত্যা এবং রাজনৈতিক ডাকাতি সংগঠিত করত।

এ প্রসঙ্গে পরাধীন বাংলার প্রখ্যাত বিপ্লবী তারাপদ লাহিড়ী মহাশয় যে তথ্য দিয়েছেন তা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি জানিয়েছেন ঃ

"দেশব্যাপী বৈপ্লবিক সংগঠনকে চালু রাখতে, তাকে সর্বস্তরে প্রসারিত করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হত। এজন্য বিপ্লবীদেরকে বাধ্য হয়ে রাজনৈতিক ডাকাতির পথ ধরতে হয়। এ বিষয়ে প্রথমে বিপ্লবীদের মনে দ্বিধা সঙ্কোচ ছিল। ১৯০৬ সালে, ডাকাতি করা উচিত হবে কি না এ সম্বন্ধে কর্তব্য স্থির করবার জন্য রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে এক গোপন বৈঠক হয়।

অনুশীলন সমিতির সভাপতি, ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের অগ্রপথিক ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র ওই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন—শ্রী অরবিন্দ, রাজা সুবোধ মল্লিক, বারীন ঘোষ, সমিতির সম্পাদক সতীশ বসু, ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিন বিহারী দাস ও নরেন্দ্রমোহন সেন প্রমুখ। প্রমথনাথ প্রথমে ডাকাতির কার্যক্রম গ্রহণে সম্মত ছিলেন না। অরবিন্দ দৃঢ়ভাবে ডাকাতি কার্যক্রম সমর্থন করেন। পরে সর্বসম্মতিক্রমে কতকগুলি শর্তাধীনে ডাকাতি কার্যক্রম অনুমোদিত হয়। শর্তগুলি ছিল ঃ যারা অসাধু উপায়ে অর্থ অর্জন করেছে, যারা সুদখোর, অসচ্চরিত্র, অত্যাচারী শুধু এই শ্রেণির লোকের বাড়িতে ডাকাতি করা হবে। ডাকাতি করতে গিয়ে অকারণ নরহত্যা করা হবে না, স্ত্রীলোকের অঙ্গস্পর্শ করা চলবে না। ডাকাতিলব্ধ অর্থের একটি পয়সা কেউ নিজের জন্য গ্রহণ করতে পারবেন না ইত্যাদি।

এই সকল নিয়ম কঠোর ভাবে পালন করা হত।

১৯০৭ থেকে ১৯১৭ এই এগারো বছরে সারা ভারতে ডাকাতি, গুপ্তচরবৃত্তি, অত্যাচারী সরকারি কর্মচারীদের হত্যা বা হত্যার প্রচেষ্টা, অস্ত্রসংগ্রহ ইত্যাদি ব্যাপারে ৩৮৫ টি বৈপ্লবিক অ্যাকশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে বেশিরভাগ অ্যাকশন হয়েছে বঙ্গদেশে।"

কিন্তু যেহেতু সরকারপক্ষ আদালতে প্রমাণ করার মতো উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করতে পারছিল না তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইসব ডাকাতি কেসগুলিকে 'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র' হিসাবে প্রতিপন্ন করার কৌশল নিয়েছিল। কারণ হত্যা বা ডাকাতির অপরাধে শুধুমাত্র অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই দণ্ডিত করা যায়, কিন্তু ষড়যন্ত্র মামলা সাজাতে পারলে সেই অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সন্দেহভাজনকেও ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত এবং দণ্ডিত করা সম্ভব। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভাঙতে এই পথই সেদিন নিয়েছিল বিদেশি সরকার।

অতপর এই ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯০৮ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত বহু বিপ্লবীকে ডাকাতি এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলায় শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। অনেককেই প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় অথবা পাঠানো হয় দ্বীপান্তরে। আন্দামানের 'সেলুলার জেল'-এ অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় জীবন কাটাতে বাধ্য হন এই দেশপ্রেমী বিদ্রোহীরা।

প্রায় এক সহস্রাব্দ কাল

(মধ্য প্রদেশের পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা অঞ্চল)

মধ্য প্রদেশের ভিণ্ড, মোরেনা, শিবপুরী, গোয়ালিয়ার এবং দাতিয়া জেলার এক বিস্তীর্ণ এলাকা দুর্ভেদ্য পাহাড় খরস্রোতা নদী এবং অরণ্য অধ্যুষিত। বিভীষিকাময় এই জঙ্গল প্রদেশটিকে বলা হয় 'বেহড়' আর সমগ্র অঞ্চলটির নাম 'চম্বল'।

এই 'চম্বল' নামটির সঙ্গে যুগ-যুগ ধরে জড়িয়ে আছে ভয়ঙ্কর সব উপাখ্যান। এখানকার যারা বাসিন্দা তারা কেউ সাধারণ মানুষ নয়—দুর্ধর্ষ ডাকাত।

ডাকাত অধ্যুষিত চম্বলের কুখ্যাতি

বহুবছর ধরে। ইংরেজ আমল থেকে এর পরিচিতি বাড়লেও ঐতিহাসিকদের মতে এখানকার সমস্যার সূত্রপাত হয় সেই দ্বাদশ শতাব্দীতে পৃথ্বিরাজ চৌহানের আমল থেকেই। সেই সময় থেকেই রাজপুতদের কলহবিবাদ বৃদ্ধি পায়। শুরু হয় হানাহানি। প্রতিশোধ-পালটা প্রতিশোধের পালা। 'বেহড়'-এর জঙ্গল বিদ্রোহীদের লুকিয়ে থাকার পক্ষে ছিল আদর্শ জায়গা। এ ছাড়াও অর্থনৈতিক নিপীড়ন, জাতপাতের দ্বন্দ্ব চম্বলের সদস্যসংখ্যা বছর-বছর বাড়িয়ে তুলেছে। প্রকৃতিগত ভাবেই এখানকার জনগোষ্ঠী তাদের ওপর অবিচার অত্যাচারের বদলা হিসাবে বেছে নেয় 'দাঁতের বদলে দাঁত', 'চোখের বদলে চোখ'-এর মধ্যযুগীয় রীতি। এভাবেই চম্বলের বেহড় জঙ্গলে বিভিন্ন সময় দাপিয়ে বেড়িয়েছে দুল্লা, পঞ্চম সিং, চরজামল্লাহ, সুলতান সিং, মানসিং, রূপা সিং, পুতলিবাঈ, ফুলনদেবীর মতো ডাকাত সর্দার এবং ডাকাত রথীরা। এদের মধ্যে ফুলনদেবী তো আবার পরবর্তীকালে ডাকাতি ছেড়ে উত্তর প্রদেশের এক রাজনৈতিক দলের নেত্রী এবং সংসদ হয়ে রাজনীতির অঙ্গনও দাপিয়ে বেড়িয়েছে।

শুধু কি তাই, এই চম্বলের ডাকাত এবং তাদের রোমাঞ্চকর জীবনধারা নিয়ে বা তার ছায়া অবলম্বনে আমাদের বলিউড এবং টলিউডে বিভিন্ন সময়ে তৈরি হয়েছে 'সিনেমা'। এর মধ্যে অনেকগুলিই সুপারহিট।

আধুনিক কাল

(ডাকাতি জল-স্থল-অন্তরীক্ষে)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সারা পৃথিবীতেই ক্রাইম-এর ধরনধারণ পালটেছে। আসলে মানুষের নৈতিকমান হ্রাস পাওয়ায় সামাজিক অধ্যায় যেমন বেড়েছে সেইসঙ্গে বিজ্ঞান প্রযুক্তির সঙ্গে তাল দিয়ে জল-স্থল-অন্তরীক্ষে ডাকাতির নতুন-নতুন ক্ষেত্র এবং পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হচ্ছে।

আজ যে-কোনও প্রভাতী সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা ওলটালেই প্রতিদিন একাধিক ডাকাতির ঘটনা নজরে পড়ে। টিভিতে চোখ রাখলেই দেখা যায় রোমহর্ষক সব ডাকাতির ঘটনা।

নানা কারণে নানা উদ্দেশ্যে এই সব ডাকাতি।

ব্যাঙ্ক ডাকাতি, ট্রেন ডাকাতি, জলে ডাকাতি এবং বিমান দস্যুদের দ্বারা সংগঠিত 'প্লেন হাইজ্যাক', কোনওটাই আর নতুন ঘটনা নয়। নতুনত্ব শুধু ঘটনার বৈচিত্র্য এবং পদ্ধতিতে। এর মধ্যে কোনও ডাকাতির পেছনে থাকে রাজনৈতিক কারণ। কোনওটা বা ব্যক্তিগত কিংবা স্রেফ অর্থনৈতিক লুঠপাট।

আধুনিক নগর সভ্যতার যুগে আর-এক ধরনের ডাকাতির খবর আমরা প্রায়ই পাই, তা হল নির্জন ফ্ল্যাটের মধ্যে ডাকাত দল একাকী গৃহকর্ত্রী অথবা অসহায় বৃদ্ধ মানুষটিকে খুন করে তার সঞ্চিত সব সম্পদ লুটে নিয়ে যায়। এ ধরনের মানুষগুলো হয় তাদের 'সফট টার্গেট'। কারণ আধুনিক ফ্ল্যাট-কালচারের অনিবার্য পরিণতিতে সেই আক্রান্ত থাকে আশপাশের এবং প্রতিবেশীদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। ডাকাতদল এই সুযোগটাই সহজে নেয়। আর অনেক ক্ষেত্রেই এই ডাকাতদলের কোনও এক সদস্য সেই ফ্ল্যাটেরই কোনও গৃহভৃত্য, কেয়ারটেকার অথবা আশ্রিত পরিজন। এক্ষেত্রে 'রক্ষকই' হয় 'ভক্ষক'।

এ সব ঘটনার মধ্যে একটা ছবি কিন্তু ভেসে ওঠে, তা হল এককালে ডাকাতদলের মধ্যেও সাধারণ ভাবে যে একটা নৈতিক মান ছিল, অর্থাৎ নিরস্ত্র, অসহায় অথবা কোনও নারীকে হত্যা না করা, অকারণ রক্তপাত না ঘটানো—আজ আর তা মানা হয় না।

এ প্রসঙ্গে পুরোনো বাংলার ডাকাতদলের আচরণ সম্পর্কে একটা গল্প মনে পড়ে গেল। গল্প হলেও মনে হয় এর মধ্যে কিছুটা সত্যতা আছে।

ব্যাপারটা এইরকম—

সে আমলে অনেকসময় ডাকাতদল কোনও গৃহস্থ বাড়িতে রাতের বেলা ডাকাতি করার আগে অতিথি সেজে এসে খেতে চাইত। কিন্তু গৃহস্বামীকে বলত তাদের জন্য তরকারিতে 'নুন' না দিতে। কোনও একটা অজুহাত নিশ্চয়ই দিত। আসল কারণ যাদের বাড়ির সে নুন খেয়েছে, সে বাড়িতে 'নিমক হরামি' বা ডাকাতি করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এমন গল্পও শোনা গেছে, সেই গৃহস্বামী এই রাতের অতিথিদের আসল উদ্দেশ্য বুঝে বুদ্ধি করে তাদের কোনওভাবে 'নুন' খাইয়ে দিত এবং এ ভাবেই সেই ডাকাতদলের হাত থেকে শুধু সে রাতেই নয় বরাবরের জন্য বেঁচে যেত।

এমন গল্প গ্রামগঞ্জে পুরোনো মানুষদের কাছে আজও শোনা যায়।

আজ কিন্তু এসব বোধ গোটা সমাজ থেকেই হারিয়ে যেতে বসেছে। এর কী কারণ এবং এসবের পরিণতিই বা কী, তা বলবেন আধুনিক সমাজ তত্ত্ববিদরা।

আমরা বরং আর-একবার উত্তর খোঁজবার চেষ্টা করি—মানুষ কেন ডাকাত হয়?

মানুষ কেন ডাকাত হয়?

কেন? শুধুই কি অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কারণে?

এর উৎস খুঁজতে আমাদের একবার উঁকি দিতে হবে মানব সভ্যতার একেবারে সেই আদি লগ্নে।

আজ থেকে কয়েক লক্ষ বছর আগে। মানুষ যেদিন প্রথম গোষ্ঠীবদ্ধ হতে শিখল, গড়ে তুলল আদিম সাম্যবাদী সমাজ।

মানুষ তখন অরণ্যচারী, গুহাবাসী।

দিনের আলো ফুটলেই তারা দল বেঁধে বেরুত শিকার অন্বেষণে। সারাদিন যা শিকার জুটত দিন শেষে তাই নিয়ে আসত গুহার আস্তানায়। সেখানে সবাই মিলে ভাগ করে খেত। তখনও গড়ে ওঠেনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা।

আর যেহেতু ব্যক্তিগত ভাবে কেউ সম্পত্তির অধিকারী ছিল না। তাই অন্যকে বঞ্চিত বা শোষণ করার প্রশ্নও ছিল না। আর সে কারণেই অন্যের সম্পদ কেড়ে নেওয়া বা ডাকাতি করার প্রয়োজনও ছিল না।

কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হল।

সভ্যতার পরবর্তী পর্যায়ে শুরু হল এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর ভেদ-দ্বন্দ্ব। প্রত্যেকেরই আলাদা 'টোটেম' বা প্রতীক। যেমন কারুর টোটেম 'কচ্ছপ' (কাশ্যপ), কারুর বা 'ষণ্ড' (শাণ্ডিল্য) ইত্যাদি। প্রতিটি গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষই হল গোষ্ঠী নেতা। ক্রমে এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর ওপর প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য প্রয়াসী হল। শুরু হল এলাকা দখলের লড়াই। আরও বেশি কৃষিজমি, গবাদি পশু অধিকারের জন্য যুদ্ধ। যুদ্ধশেষে বিজয়ীপক্ষ বিজিত

নারী-পুরুষকে দাস করে নিয়ে এল নিজেদের অধিকারে। তাদের ওপর শুরু হল নিপীড়নের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

দুর্বল পরাজিতের ওপর শক্তিমান প্রভুর এই অত্যাচারের কাহিনি জুড়ে আছে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশের ইতিহাসে।

এক সময় এই শোষিত অত্যাচারিতের দল ঘুরে দাঁড়াতে চাইত। অস্ত্র হাতে দলবদ্ধভাবে কেড়ে নিতে চাইত ধনীর সম্পদ। তখন তাদের বলা হত ডাকাত।

এমন ঘটনা আমরা দেখেছি ভারতবর্ষে ইংরেজ অধিকারের গোড়ার পর্বেই। একথা আমরা আগেই বলেছি। এ সময়ে তৎকালীন ইংরেজ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলাদেশের ডাকাত সম্পর্কে ইংল্যান্ডে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন তার কিছুটা উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন ঃ

"বাংলাদেশের ডাকাতরা খুনি-দস্যুদের জাতি। তারা বংশানুক্রমে সমাজের বিরুদ্ধে সকল সময়ই যুদ্ধ চালিয়ে গ্রাম, ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে আর গ্রামবাসীদের হত্যা করে জীবিকা নির্বাহ করে।"

এসব প্রকৃতপক্ষে অত্যাচারী ঔপনিবেশিক শাসকের অসার কথা।

ইংরেজ শাসনের পূর্বে তুর্কি-আফগান এবং মুঘল যুগেও উৎপীড়িত মানুষ একইভাবে দারিদ্রের এবং নিপীড়নের দংশন থেকে মুক্তি পেতে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে, কখনও বা এই ডাকাতিকেই পেশা করে বাঁচতে চেয়েছে।

আসলে প্রকৃতিগত ভাবে মানুষ একটি যুদ্ধপ্রবণ জাতি। লড়াই এবং সংগ্রাম তার আদিম বৃত্তিরই অংশ এবং এই যুদ্ধ প্রবণতা, বলা ভালো প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রবণতা, তার আদিম সত্তার মধ্যে ছিল বলেই লক্ষ-লক্ষ বছরের পৃথিবীতে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে অনেক শক্তিশালী প্রাণী, হিংস্র শ্বাপদের সঙ্গে লড়াই করে শুধুমাত্র বুদ্ধিকে সম্বল করে সে এই দুনিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি হতে পেরেছে।

আর শুধু মানুষই বা কেন—প্রাণী জগতে অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও আক্রমণমুখিতার নিদর্শন কম নেই।

তাই আমরা দেখতে পাই এক গোষ্ঠীর পিঁপড়ে অন্য গোষ্ঠীর বাসস্থান আক্রমণ করে তাদের খাদ্যসম্পদ, এমনকি পিঁপড়ের ডিম (পিউপা) লুঠ করার জন্য তাদের ডাকাত লুটেরাদের পাঠায় এবং আক্রান্ত দলের সৈনিক পিঁপড়েরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। কখনও জেতে, কখনও হারে।

অরণ্যচারী পশু-পাখিদের মধ্যেও এমন ডাকাতির দৃষ্টান্ত কম নেই।

ডাকাত সাহিত্যে—সাহিত্যে ডাকাত

বেশ কিছুকাল আগে বিদেশের এক নামকরা ছোটদের পত্রিকার পাঠকদের মধ্যে একটা সমীক্ষা হয়েছিল, তারা কীরকম গল্প পড়তে ভালোবাসে? অধিকাংশ পাঠকই উত্তর দিয়েছিল—ভূতের গল্প, ডাকাতের গল্প।

আসলে রক্ত তোলপাড় করা ডাকাতের কাহিনি সববয়সি পাঠকই পড়তে ভালোবাসেন। আর বিশ্বসাহিত্যে আজপর্যন্ত যত গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে তার মধ্যে ডাকাতদের নিয়ে লেখা গল্প-উপন্যাসের সংখ্যা নেহাত কম নয়।

বিশ্বসাহিত্যে এমন কাহিনি বলতে প্রথমেই যে বইটির কথা মনে পড়ে তা হল "দ্যা অ্যাডভেঞ্চারস অফ রবিনহুড'। এটির লেখক হিসেবে কিন্তু কারুর নাম উল্লেখিত নেই। আসলে শেরউড অরণ্যের ডাকাত রবিন হুড কোনও লেখকের কল্পনায় গড়া চরিত্র নয়। বাস্তবেও তার অস্তিত্ব ছিল। সে ডাকাতি করে ধনী সম্প্রদায়ের অর্থ গরিবের মধ্যে বিলিয়ে দিত। তাই ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষের কাছে সে হয়ে উঠেছিল পছন্দের নায়ক। তাকে অবলম্বন করে পরবর্তীকালেও রচিত হয়েছিল বেশ কয়েকটি কাহিনি। স্বাভাবিক ভাবেই সব কাহিনির মধ্যে মিল ছিল না। তবে মিল একটাই ছিল, তা হল,

ধনীর ত্রাস দরিদ্রের বন্ধু।

আমাদের বাংলা সাহিত্যেও অনুরূপ ডাকাতের সন্ধান মিলেছিল ঊনবিংশ শতকে। এরাও ছিল ইংরেজ শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চরিত্র। এই সব বাংলার 'রবিন হুড'দের মধ্যে ছিল বিশে ডাকাত, রঘু ডাকাত, আরও অনেক ডাকাত-চরিত্র। এদের নিয়ে পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে অনেক গল্প-উপন্যাস।

তবে এইসব কাহিনির মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত 'বাংলার ডাকাত' বইটির কথা।

বইটির ভূমিকায় লেখক লিখেছেন ঃ

"আমার এ 'বাংলার ডাকাত'-এর গল্পগুলি বাংলা সরকারের দপ্তরখানার পুরোনো কাগজপত্র, সেকালের সংবাদপত্র ও ইতিহাস হইতে সংগৃহীত। কাল্পনিক কোনও গল্প নাই। সত্য যাহা ঘটিয়াছে এবং ঘটিত সেকথাই আমি বলিয়াছি। আমার লেখা যে গল্প কয়টি এ বইতে আছে তাহার ভিতর অনেক রকমের ডাকাতের কাহিনিই পাইবে।"

বস্তুত এই বইটি অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ডাকাত দলের কীর্তিকাহিনির এক অমূল্য দলিল বলা যায়।

এতে আছে বিভিন্ন ধরনের ডাকাত এবং ডাকাতির কাহিনি।

এবার বলি ডাকাত চিত্রেশ্বর ও দেবী চিত্রেশ্বরীর গল্প। আজকের কলকাতায় চিৎপুর এলাকায় যে চিত্রেশ্বরী দেবীর মন্দির আছে তা নাকি এককালে চিত্রেশ্বর বা চিতু ডাকাতের আরাধ্য দেবী। প্রতিদিন এই দেবীর সামনে নরবলি দিয়ে পুজো করে তবে ডাকাতি করতে বেরুত চিতু ডাকাতের দল। সময়টা পলাশীর যুদ্ধের কিছু আগে। সে সময়ে কলকাতার ওই অঞ্চলটা ছিল গভীর জঙ্গলে ঢাকা। এই চিতু এমন দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিল যে তার সঙ্গে কোম্পানি ফৌজও এঁটে উঠতে পারত না। কলকাতা আজ আমূল পালটে গেছে—কিন্তু আজও চিতু ডাকাতের স্মৃতি বহন করছে চিৎপুর এবং আজও পূজিত হচ্ছেন ওর আরাধ্য জাগ্রতদেবী চিত্রেশ্বরী।

'বাংলার ডাকাত' বইটিতে আরও নানাধরনের ডাকাতের কাহিনি আছে। তার মধ্যে একটা মজার কাহিনি উল্লেখ করি ঃ

'একবার দুই ডাকাতপুঙ্গব মা সিদ্ধেশ্বরীর পুজো দিয়েও ডাকাতি করতে গিয়ে কোম্পানির পুলিশের হাতে ধরা পড়ল এবং তাদের প্রাণদণ্ড হল। তখন সেই দুই ডাকাত ভাবল মা সিদ্ধেশ্বরী যখন তাদের বাঁচাতে পারলেন না, তখন বরং যীশু খ্রিস্টেরই শরণাপন্ন হওয়া যাক। এই ভেবে তারা খ্রিস্টান হতে চাইল। শুনে তো খ্রিস্টান পাদ্রি সাহেবের আনন্দ ধরে না। তিনি এসে দুই ডাকাতকে ধর্মান্তরিত করলেন। কিন্তু হায়! তাতেও তাদের প্রাণদণ্ড রোধ হল না। তবে তাদের প্রাণনাশ হওয়ার পর রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের লোকেরা এই দুই দেশি খ্রিস্টান ডাকাতকে বেশ ধূমধাম করে সমাধিস্থ করেছিল।

এ ধরনের আরও অনেক কৌতূহলদ্দীপক গল্প আছে বাংলার ডাকাত বইতে। বিশে ডাকাত, রঘু ডাকাতের কাহিনি তো আছেই।

বাংলা সাহিত্যে আরও বেশ কিছু ডাকাতের গল্প লেখা হয়েছে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখ আরও অনেকেই আছেন।

এদের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বামা' গল্পটির কথা মনে পড়ছে।

বারুইকন্যা বামার এমন একটি গ্রামে বিয়ে হয়েছিল যেখানে গ্রাম শুদ্ধু মানুষ ছিল ফাঁসুড়ে ডাকাত, অর্থাৎ ঘরে অতিথি হয়ে যে পথিক রাত কাটাতে আসত তাকে হত্যা করে সর্বস্ব লুঠ করা হতো। এটাই ছিল তাদের পেশা। অর্থাৎ প্রাচীন বাংলার গ্রামগুলিতে একদিকে যেমন অতিথিকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা করার রীতি ছিল, তেমনি বিপরীত চিত্রটাও একেবারে বিরল ছিল না। এবং কোনও-কোনও গ্রামের মানুষদের এটাই ছিল জীবিকা। অর্থাৎ যারা জানত এই সকল গ্রামকে 'ফাঁসুড়ে ডাকাত'-এর গ্রাম রূপে চিত্রিত করত। কিন্তু দূরপথযাত্রী পথিকের পক্ষে তা সবসময় জানা সম্ভব হত না।

কিন্তু না জেনেবুঝেই বামার এমন একটি গ্রামে এক ফাঁসুড়ে ডাকাত পরিবারে বিয়ে হয়েছিল, যাদের এই পেশাকে সে কখনই মনপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি। এ অবস্থায় রাতে এসে সেই পরিবারে আশ্রয় নেওয়া এক অসহায় ব্রাহ্মণকে বামা কি কৌশলে অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল সেটাই এই গল্প। লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে এ এক দারুণ চিত্তাকর্ষক কাহিনি।

রাধারমন রায়ের 'কলকাতার সাহেব ডাকাত'-এর সত্যি কাহিনিটিও উল্লেখ না করে পারছি না।

এটা বাংলার সেই প্রথম ইংরেজ অধিকারের সময়কার, অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকের রচনা নিয়ে গল্প। সে সময়ে কলকাতায় এক নৃশংস সাহেব-ডাকাতের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। তার নাম 'রুসো'। তার দলে অন্তত দুশো ইউরোপীয়ান ডাকাত ছিল আর একজন দেশি গুপ্তচর ছিল, মোহনপাল। মোহন বিভিন্ন জায়গা থেকে 'শিকার'-এর খোঁজ নিয়ে আসত। কিন্তু শেষপর্যন্ত রুসো ধরা পড়েছিল নিজের দলের মধ্যেই ডাকাতির মালের বখরা নিয়ে ঝামেলায়। বিচারে সাহেব-ডাকাত রুসোর ফাঁসির হুকুম হল। আর সে হুকুম কার্যকরী হয়েছিল বর্তমান কলকাতার 'ফ্যান্সি লেন'-এর নিকটবর্তী এক বাজারে।

তবে এতক্ষণ যা বলা হল তা সবই বন্দুক-পিস্তল-তলোয়ার-লাঠিসড়কি নিয়ে আক্রমণকারী ডাকাতদের কাহিনি।

এরা ছাড়াও আর-এক শ্রেণির কথাও এখানে উল্লেখ করা বোধকরি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

এঁরা আধুনিক সভ্য সমাজের মান্যগণ্য মানুষ। তাঁদের অবলম্বন বলতে কলম, তুলি অথবা অন্য কোনও শিল্পমাধ্যম। তাঁরা বুদ্ধিজীবি। কেউ সাহিত্যিক, সম্পাদক, সুরকার অথবা চিত্রশিল্পী। এঁরা অনেকেই যথেষ্ট প্রতিভাবান। তবু এঁদের মধ্যে কারুর-কারুর সম্পর্কে মাঝে-মাঝেই অভিযোগ শোনা যায়। তাঁরা নাকি অন্যের সাহিত্য-শিল্প অথবা সঙ্গীতের সুর অনুমতি ছাড়াই আত্মস্থ করে 'যশ-লুণ্ঠন' করেছেন। তাই যদি সত্যিই করে থাকেন, তবে তাঁকেও কি এক শ্রেণির 'ডাকাত' বলা যাবে না? এমন দৃষ্টান্ত কিন্তু সারা বিশ্বে কিছু কম নেই।

এ নিবন্ধের উপসংহারে এঁদের কথাটা উল্লেখ না করলে বোধকরি ডাকাতির অধ্যায়টা অসম্পূর্ণই থেকে যেত!

ছবি সৌরীশ মিত্র

কুমার মিত্র

দেবানন্দ

মোগল বাদশাহদের আমলে আরবি-ফারসি ভাষা জানলে সরকারি সেরেস্তায় মোটা মাইনের কাজ জুটে যেত। উচ্চাকাঙ্ক্ষী হিন্দু যুবকেরাও মৌলবি-মৌলানাদের কাছে এ দুটো ভাষার পাঠ নিতে ছুটে যেত এবং ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগ পেত। তবে গোঁড়া হিন্দু পরিবার আরবি-ফারসিকে মর্যাদা দিতে চাইত না। দেবানন্দ দত্তের বাড়ির মানুষজনও ছিল এরকম। তার বাবা-মা ছিলেন সেকেলে ধাঁচের মানুষ। রক্ষণশীল। দেবদ্বিজে তাঁদের অচলা ভক্তি। গৃহদেবতার পুজো না করে জলগ্রহণ করতেন না। আর মর্যাদা দেওয়ার মতো ভাষা তাঁদের কাছে একটাই। সংস্কৃত। দেবভাষা বলে কথা। এই ভাষাতেই তো রয়েছে কালিদাস, ভবভূতির অমর সৃষ্টি। এমন পরিবারে জন্মানো উদারমনা আর উচ্চাকাঙ্ক্ষী দেবানন্দের পক্ষে দুর্ভাগ্যই বলতে হবে।

নিতান্ত দরিদ্র না হলেও ধনদৌলত তাদের অল্পই। অন্যদিকে দেবানন্দের বিত্তবাসনা ছিল। তার ধারণা ছিল মুসলমানি জমানায় আরবি-ফারসি না জানলে ক্ষুদ্র গ্রামজীবনের চৌহদ্দির মধ্যেই আটকে থাকতে হবে, দেশ-দেশান্তরে যাত্রা করে ভাগ্য ফেরাবার সুযোগ আসবে না। তাই চতুষ্পাঠীতে ন্যায়-স্মৃতি-ব্যাকরণের পাঠ সমাপ্ত করে দেবানন্দ পিতার কাছে গেল। বলল,—এখানকার লেখাপড়া তো চুকল। এবার আমাকে গ্রাম ছেড়ে বাইরে যেতে হবে। আরবি-ফারসি শিখতে চাই।

পিতা উত্তপ্ত কণ্ঠে বললেন,—সে তো ম্লেচ্ছ ভাষা।

দেবানন্দ প্রতিবাদের সুরে বলল,— ভাষা কখনও ম্লেচ্ছ হয় না, বাবা। একজন মৌলবির কাছে আরবি ভাষা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ভাষা। ফারসিরও খুব কদর।

দেবানন্দের পিতা সুর নরম করে বললেন,—বুঝলাম। কিন্তু হঠাৎ আরবি-ফারসি কেন শিখতে চাও?

—আজকের দুনিয়ায় ওই দুটো ভাষা জানলে অর্থ উপার্জনের পথ খুলে যায়। আমাকে তুমি বাইরে যাওয়ার অনুমতি দাও বাবা। এ অঞ্চলে আরবি-ফারসিতে দড় তেমন কেউ নেই।

নিজের জেদি পুত্রকে চিনতেন দেবানন্দের পিতা। নিজেও কম জেদি নন, তবে পুত্রের যুক্তির কাছে হার মানল তাঁর জেদ। বললেন,—তোমার উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চাই না, দেবানন্দ। তা শিখবে কোথায়?

—বর্ধমানে যেতে হবে। মৌলবি আক্রাম খাঁর বাড়ি ওখানে। খুব নামডাক। যত্ন করে শেখান। ওঁর কাছে হিন্দু-মুসলমানের কোনও প্রভেদ নেই।

—বেশ, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

চার বছরের মধ্যে আরবি-ফারসি রপ্ত করে ফেলল আশ্চর্য ধীশক্তির অধিকারী দেবানন্দ। আক্রাম খাঁ স্বীকার করতে বাধ্য হলেন এমন তীক্ষ্ণধী ছাত্র শিক্ষকজীবনে তিনি বিশেষ পাননি।

গ্রামের মধ্যে দেবানন্দর কদর বেড়ে গেল রীতিমতো। কিন্তু গ্রামে কদর হলেই তো কারও ভাগ্য ফিরে যায় না। বাইরের পৃথিবী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে প্রতিনিয়ত, কিন্তু স্নেহশীল মাতাপিতার স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ার মতো মনের জোর সে পায় না। সে বন্ধুবান্ধবদের সবাইকে নিজের স্বপ্নের কথা শোনায়। বলে,—বুঝলি, এই গাঁয়ে পড়ে থেকে কিস্যু হবে না। কপাল ফেরাতে চাও তো গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ো। আমিও এবার গ্রামের মায়া কাটাব ভাবছি।

শ্রোতারা বলে,—এ তো তুমি অনেকদিন ধরেই বলছ।

—বাবা-মার জন্যে পারছি না রে। একেবারে ছেলে অন্তপ্রাণ ওরা। আমি চলে গেলে বড্ড কষ্ট পাবে।

—তাহলে এখানেই পড়ে থাকো। আরবি-ফারসি শেখা বৃথা হল তোমার।

হয়তো দোটানায় পড়ে শেষপর্যন্ত গ্রাম ছাড়াই হত না দেবানন্দের, কিন্তু মানুষ ভাগ্যের হাতের পুতুল। সেই ভাগ্যই তাকে গ্রামের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল্লিতে উড়িয়ে নিয়ে গেল।

ঘটনাটা আশ্চর্যই বটে। সে নজরে পড়ে গেল খোদ শাজাহানের। অবশ্য তখনও তিনি শাহজাদা, ভারতসম্রাট শাজাহান নন। আর এটাও সত্যি যে, 'নজর'টা একটু এদিক-ওদিক হলে দেবানন্দের প্রাণটাই চলে যেত। শাহজাদার বিরাগভাজন হলে 'কোতল' হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

রোজকার মতো সেদিনও স্নানবিলাসী দেবানন্দ স্নান করতে গিয়েছিল নদীতে। পুকুর-টুকুরে স্নান করে সে তৃপ্তি পেত না। ক'পা হাঁটলেই পুণ্যতোয়া সরস্বতী। সেই সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে সরস্বতী দিয়ে সাগরগামী জাহাজও যাতায়াত করতে পারত। সময়টা দুপুর। নদীর ধারে গিয়ে দেখে অনেক মানুষের ভিড়। সবাই চেনাজানা। গ্রামেরই মানুষ সব।

সমবয়েসি একজনকে দেবানন্দ জিগ্যেস করল,—এত লোক কীসের জন্যে ব্রজেন্দ্র?

ব্রজেন্দ্র বলল,—লোক আসবে না! তুমি কিছু জানো না দেখছি। আরে শাহজাদা শাজাহান যে সপ্তগ্রাম বন্দর দেখতে যাচ্ছেন। ওই তো শাহজাদার বজরা বাঁধা। সামনে পেছনে আগলদার নৌকোর বহর। ওড়িষা থেকে ফেরার পথে সপ্তগ্রাম দেখার ইচ্ছে হয়েছে। তাই বাদশাজাদাকে দেখতে ছুটে এসেছে লোক। ওই দ্যাখো, তিনি বজরার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন।

দেবানন্দ কৌতূহলী চোখে বজরার দিকে তাকাল। খানদানি চেহারা আর মহার্ঘ পোশাক। সহজেই বোঝা যায় বজরার অলিন্দে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি আমজনতার কেউ নন। এমন একজন, যিনি জন্ম-অভিজাত, তাঁর নাকের তীক্ষ্ণতা, কপালের গঠন, মুখের ছাঁদ আর গায়ের রঙে মোগল খানদানের ছাপ সুস্পষ্ট। মধ্যাহ্নের উজ্জ্বল রোদ্দুরে তাঁকে দেবদূতের মতো মনে হচ্ছে। নদীতীরের মানুষজন তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।

দেবানন্দের একটু তাড়া ছিল। সূর্য মাঝ-আকাশ ছাড়িয়ে যেতে বসেছে। বাবা পুজোপাঠ সেরে অপেক্ষা করে আছেন। ছেলে ফিরলে একসঙ্গে আহারাদি সারবেন। স্নান সারার জন্যে জলে নামল দেবানন্দ। কিন্তু স্নান করবে কী, বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে গিয়েছে তার। বিরক্তি কেন?

হওয়ারই কথা। আরবি-ফারসিতে দক্ষ কোনও ব্যক্তি যদি ভুল উচ্চারণে, ভুল ছন্দস্পন্দে ফারসি কাব্য কাউকে পড়তে শোনে তাহলে বিরক্তিতে তার ভ্রূকুঞ্জন হওয়ারই কথা। আর সেই ব্যাপারটাই ঘটেছে দেবানন্দের ক্ষেত্রে। বাদশাজাদার বজরায় কেউ একজন ফারসি কাব্য পাঠ করছে জোরালো গলায়, সম্ভবত বাদশাজাদাকেই শোনাচ্ছে। কিন্তু লোকটার উচ্চারণ অশুদ্ধ, ছন্দজ্ঞানের একান্ত অভাব। মুঘল বাদশার পুত্র কাব্যরসিক হবেন তাতে আশ্চর্য কী! কিন্তু এই পাঠ তিনি সহ্য করছেন কেমন করে? তিনি কি কাব্য-সাহিত্যের সমঝদার নন? পাঠের ভুল ধরার যোগ্যতা কি তাঁর নেই?

এইসব ভাবতে-ভাবতে দেবানন্দ কখন যে সশব্দে হেসে ফেলেছে তা তার খেয়াল নেই।

দেবানন্দের প্রাণখোলা হাসির আওয়াজে ভুরু কুঁচকে উঠেছে খোদ শাহজাদার। এ কোন বে-আদব বেত্‌মিজ যে ভারতেশ্বর জাহাঙ্গিরের পুত্রের সামনে এমন বেশরম হাসি হাসার স্পর্ধা দেখায়! না, লোকটাকে একটু সমঝে দেওয়া দরকার। কাছাকাছি দুজন পালোয়ান চেহারার দেহরক্ষী মজুত। তাদের বললেন,—ওই যে ফরসা ছোকরাটা নদীতে গোসল করতে নেমেছে, ওই বেতমিজটাকে ধরে আনো।

শিকারি ঈগল যেমন ছোঁ মেরে শিকারকে তুলে নিয়ে যায় তারা প্রায় তেমনি করেই দেবানন্দকে বজরায় তুলে নিয়ে গেল। দেবানন্দ বুঝল অট্টহাসি হেসে সে নিজের বিপদ ডেকে এনেছে।

শাহজাদা শুধোলেন,—আমাকে চেনো?

দেবানন্দ সেলাম জানিয়ে বলল,—গোস্তাকি মাফ করবেন, আমি নিশ্চয়ই দিল্লিশ্বর জাহাঙ্গিরের পুত্র শাহজাদা শাজাহানের সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য লাভ করেছি।

দেবানন্দের চোস্ত দরবারি সংলাপে শাজাহান খুশি হয়ে বললেন,—তোমাকে বুদ্ধিমান মনে হচ্ছে। কিন্তু তুমি বেশরম, বেলাজ। একটু আগে অমন হোহো করে হাসছিলে কেন? জানো না, কোনও শাহজাদার সামনে অমন করে হাসতে নেই?

—খোদাবন্দ, আমি হাসছিলাম অন্য কারণে।

—কী কারণ?

—আপনার বজরায় কেউ একজন ফারসি কাব্য পাঠ করছিলেন। যিনি পাঠ করছিলেন তাঁর উচ্চারণ অশুদ্ধ, ছন্দবোধ নেই। তাই শ্রুতিমাধুর্য আসছিল না। সেজন্যেই হেসে ফেলেছিলাম। যদি অপরাধ হয়ে থাকে মার্জনা করুন।

শাজাহান অবাক হয়ে বললেন,—তুমি ফারসি জান?

—জানি সামান্য। আরবিও জানি।

—বটে। শোনাও তাহলে। মনে রেখো, সম্রাটপুত্রের সঙ্গে তামাসা তোমার বিপদের কারণ হতে পারে।

—জানি।

দেবানন্দের আর যাই হোক সাহসের অভাব ছিল না। সে অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে পুথি হাতে নিয়ে পাঠ করতে শুরু করল। তার স্বর সুললিত। পড়ার ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছিল ফারসি ভাষায় তার দখল যথেষ্ট। নির্জন মধ্যাহ্নে তার মন্দ্র অথচ সুরেলা কণ্ঠস্বর মিশে যাচ্ছিল নদীর বাতাসে। বাদশাজাদা ঠোঁটে বাঁকা হাসি নিয়ে পাঠ শোনার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন, কখন তা মিলিয়ে গিয়েছে, এখন তিনি মুগ্ধ শ্রোতা। সম্রাটতনয় হিসেবে অনেক জ্ঞানীগুণীর সংস্পর্শে এসেছেন তিনি। কিন্তু সুদূর বাংলা মুলুকে এসে এক হিন্দু যুবকের কণ্ঠে ফারসি কাব্যপাঠের এই মাধুর্য আর মাদকতা তাঁর কাছে এক অভাবিত অভিজ্ঞতা।

দেবানন্দের পাঠ শেষ হলে শাহজাদা বললেন,—তোমার হাসির কারণ বুঝলাম। এর মধ্যে কোনও তামাসা নেই। কোনও অপরাধও করনি তুমি। কী কাজ করো তুমি?

দেবানন্দ সবিনয়ে উত্তর দিল,—আমার কোনও কাজ নেই শাহজাদা। বেকার।

—তা হলে তো আরও ভালো। শোনো যুবক, তোমার মতো জ্ঞানীকে আমার খুব দরকার। আমাদের শাহী দরবারে কয়েকজন মুনশির দরকার। বুঝতেই পারছ দক্ষ লোক ছাড়া চলবে না। বাঙালিরা বুদ্ধিমান জাত। তুমি বুদ্ধিমান তো বটেই। না হলে আরবি-ফারসির মতো বিদেশি ভাষা এত ভালো শিখলে কী করে? শুধু বুদ্ধিমান নয়, তুমি সাহসীও। তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমার সঙ্গে দিল্লি চলো। তোমাকে মুনশির কাজ দেওয়া হবে। আবার সময়মতো আমাকে কাব্যপাঠ করে শোনাবে। কী, আপত্তি নেই তো?

দেবানন্দ উত্তর দিল,—এ আমার পরম সৌভাগ্য খোদবন্দ। কিন্তু আমার মা-বাবার সম্মতি নেওয়া দরকার।

শাহজাদা নেহাত কথার কথা হিসেবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন দিল্লি যেতে দেবানন্দের আপত্তি আছে কি না। সাধারণ মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কান দেওয়ার পাত্র মোঘল রাজপুত্রেরা নয়। শাহজাদা বললেন,—সে সময় তোমাকে দেওয়া যাবে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই বজরা ছাড়া হবে। দিল্লিশ্বরের পুত্রের মেহেরবানির চেয়ে তোমার মা-বাবার ইচ্ছার দাম বেশি নাকি?

দেবানন্দের বলতে ইচ্ছে করল যে একজন ধর্মপ্রাণ হিন্দুর কাছে মাতাপিতাই স্বর্গের দেবতা, সম্রাট কিংবা সম্রাটতনয়ের হুকুমের চেয়ে তাঁদের মতামত অনেক মূল্যবান, কিন্তু তার পরিণাম ভয়ঙ্কর হতে পারে। সে বুঝতে পারল শাহজাদার যখন ইচ্ছে হয়েছে তখন দিল্লি তাকে যেতেই হবে।

না, মা-বাবার সঙ্গে তার দেখা করা হল না। তাঁরা কষ্ট পাবেন ভেবে তার চোখের পাতা ভিজে গেল। তারই মধ্যে এগিয়ে চলল শাহজাদার বজরা সপ্তগ্রামের দিকে। নদীতীরে দাঁড়িয়ে নিরুপায় গ্রামবাসীরা দেখল মোগলরা দেবানন্দকে ধরে নিয়ে গেল।

॥ দুই ॥

প্রথম দিকে অসুবিধে হলেও দেবানন্দ দিল্লির পরিবেশের সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি খাপ খাইয়ে নিল। দিল্লির উপকণ্ঠে তার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। আসা-যাওয়ার জন্যে তাকে দেওয়া হয়েছে একটি ঘোড়া। আগে অভ্যাস না থাকলেও দ্রুত সে ঘোড়ায় চড়া রপ্ত করে নিয়েছে। শাহজাদার কাছে তার অবারিত দ্বার। তাঁর নির্দেশমতো সে প্রাচীন পুথি নকল করে, কাব্যপাঠ করে শোনায়। শাহজাদা কখনও শুনতে চান ফিরদৌসির শাহনামা, কখনও অলবিরুনির ভারতবৃত্তান্ত, কখনও আবুল ফজলের আকবরনামা। কখনও তাঁর শখ হয় হিন্দু পুরাণের কাহিনি শুনতে।

দেবানন্দ বেতন পায় বহু তংখা। অল্পদিনেই সে ধনবান হয়ে ওঠে। বিত্তের সঙ্গে তার চিত্তও কিছুটা বদলায়। বদলে যায় তার পোশাক-পরিচ্ছদ। ইংরেজ আমলে যেমন অনেক বাঙালি সাহেবি পোশাকে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, তেমনি মোগল আমলে অনেক হিন্দু শখ করে মোগলদের পোশাক পরত। দেবানন্দও সেই ফ্যাশনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। তার অঙ্গে উঠল জোব্বা, পায়ে উঠল নাগরা জুতো। মুখে রাখল দাড়ি। দিল্লির শুষ্ক আবহাওয়া আর উন্নত জীবন যাপনের গুণে তার চেহারাও বদলেছে। সে হয়ে উঠেছে কান্তিমান।

তবে দিল্লিবাসে অভ্যস্ত হয়ে গেলেও বাংলার এক পাড়া-গাঁর জন্য তার মন কাঁদে। কতদিন তার কানে যায়নি বাবা-মা'র স্নেহস্বর, তাঁদের আদরের ডাক। কতদিন মুখে ওঠেনি মায়ের হাতের রান্না। কানে যায়নি পূজারতির কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ। শাহজাদার সঙ্গে তাকে এমনভাবে চলে আসতে হয়েছে যে মা-বাবার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সুযোগও হয়নি। শোকার্ত মানুষ দুটি কেমনভাবে কাটাচ্ছেন কে জানে! বেঁচে আছেন কি না তাই বা কে বলবে! বেঁচে থাকলে তাঁরা হয়তো ভেবে নিয়েছেন শাহজাদার আদেশে তার প্রাণ গিয়েছে, আর সে ফিরবে না কোনওদিন। এখন তার টাকার অভাব নেই। এ টাকা তাঁদের মুখে যদি হাসি ফোটাতেই না পারল, রোজগার করে লাভ কী হল? এসব দেবানন্দ যত ভাবে ততই তার মনটা হুহু করে ওঠে।

এদিকে সম্রাট জাহাঙ্গিরের এন্তেকাল হল। শাজাহান বসলেন দিল্লির মসনদে। দেবানন্দ সেই সময় একদিন সম্রাটকে বলল,—সম্রাট, নোকরের একটা আর্জি ছিল, মেহেরবানি করে শুনুন। অনেক দিন হয়ে গেল বাংলা মুলুকে যাওয়া হয়নি। বাবা-মার চরণ দর্শনও হয়নি। একটু ঘুরে আসতে চাই।

সম্রাট বললেন,—ছুটি মঞ্জুর। তবে তুমি আমার নিজস্ব মুনশি। উচ্চ রাজকর্মচারী

বলে কথা। মোগল দরবারের কর্মচারী বিনা আড়ম্বরে যেতে পারে না। সে বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

—আপনার দয়ার অন্ত নেই সম্রাট।

নিজস্ব মুনশি মানে এখনকার ভাষায় প্রাইভেট সেক্রেটারি। তার দেশে ফেরা চাট্টিখানি কথা নয়। যাই হোক, একদিন ঘোড়সওয়ার-বাহিনি নিয়ে এবং প্রচুর ধনদৌলত নিয়ে বাংলা মুলুকের উদ্দেশে যাত্রা করল দেবানন্দ।

দীর্ঘ পাথ পার হয়ে দেবানন্দ যখন গ্রামে পৌঁছল তখন শীত শেষ হয়ে বসন্তের আগমনি শোনা যাচ্ছে। আঃ, কত কাল পরে সে গ্রামের মাটির গন্ধ পেল। গ্রামের অশত্থতলা, বুড়ো শিবের মন্দির, নাটমঞ্চ আর চণ্ডীমণ্ডপ দেখল! কিন্তু তার তন্ময়তা কেটে গেল এক অভাবিত কাণ্ডে। মানুষ তাদের দেখে যে যেদিকে পারে পালাচ্ছে। যেন চোখের সামনে দত্যিদানো দেখতে পেয়েছে তারা।

দেবানন্দ একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারত গ্রামের লোকেদের দোষ নেই। আদ্যন্ত মুসলমানের পরিচ্ছদধারী দেবানন্দকে বাঙালি ভাবার চেয়ে মোগল-পাঠান ভাবাই স্বাভাবিক। আবার তার সঙ্গে রয়েছে এক ঝাঁক খোরাসানি সৈনিক। তাদের কোমর থেকে ঝুলছে দীর্ঘ তলোয়ার। নিশ্চয়ই বদমতলবে এসেছে। লুটপাট করার পর সবাইকে মেরে-কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেবে। দাঁড়িগোঁফের জঙ্গল থেকে দেবানন্দ অবশ্য পলাতকদের অভয় দেওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। বাংলা ভাষাতেই দেবানন্দ বোঝাবার চেষ্টা করছে যে তারা বদ মতলব নিয়ে আসেনি, কিন্তু কারও সেটা বিশ্বাস হচ্ছে না।

এদিকে দেবানন্দের মা-বাবা কাদের মুখে যেন খবর পেয়েছেন মুসলমান সৈন্যরা তাঁদের বাড়ির দিকেই আসছে। রক্ষণশীল, সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের কাছে নিজের প্রাণের চেয়েও সংস্কারই বড় কথা। বিশ্বাসই শেষ কথা। দেবানন্দের বৃদ্ধ পিতা স্ত্রীকে বললেন,—চলো গিন্নি, নদীতে গিয়ে ডুবে মরি। বিধর্মী সৈন্যরা মন্দির অপবিত্র করবে, আমাদের জাতধর্ম যাবে, বিগ্রহ চূর্ণ করবে। প্রাণও যেতে পারে। প্রাণের চেয়ে মান বড়। নদীতে ঝাঁপ দিলে কোনও কিছু নিজের চোখে দেখতে হবে না।

বাড়ির খিড়কি দরজা খুলে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নদীর দিকে ছুটলেন। বৃদ্ধের সঙ্গে গৃহদেবতার বিগ্রহ। সরস্বতী তীরে গিয়ে খবর পেলেন খান সেনারা তাঁদের বাড়িতে প্রবেশ করেছে। অমনি কালবিলম্ব না করে দেবানন্দের মা-বাবা ভারী বিগ্রহের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

সেই মুহূর্তে দেবানন্দ স্বগৃহে প্রবেশ করে বাবা-মাকে ডাকাডাকি করছে,—ভয় নেই, আমি তোমাদের ছেলে দেবানন্দ। কোথায় তোমরা?

কে উত্তর দেবে? গৃহবাসীরা তো তখন নদীগর্ভে।

বুদ্ধিমান দেবানন্দ বুঝতে পারল বিধর্মী মুসলমানের পোশাক তার বিপদ ডেকে এনেছে। সে মাথা থেকে উষ্ণীষ নামাল, পা থেকে খুলল নাগরা, কোমরবন্ধ থেকে তলোয়ার। আশপাশের মানুষজনকে কাকা-জ্যাঠা, ঠাকুরদা-ঠাকুরমা ইত্যাদি সম্পর্ক ধরে ডাকাডাকি করতে লাগল, কথা বলতে লাগল খাঁটি বাংলায়। এতে কাজ হল। অনেকের ভয় কাটল। তারা পাশে এসে ভিড় জমাল। সবাই বুঝল এ তাদের গ্রামের দেবানন্দ, মোগল-পাঠান নয়, আর ওর সঙ্গে যারা এসেছে তারা লুঠেরা নয়।

অধীর আগ্রহে বয়স্ক একজনকে জিগ্যেস করল দেবানন্দ,—আমার বাবা-মাকে তো দেখছি না, ওঁরা গেলেন কোথায়?

বয়স্ক মানুষটি নিরুত্তর। বারবার জিগ্যেস করায় অন্য একজন বলল,—নিজের ভুলে তুমি বাবা-মাকে হারিয়েছ দেবানন্দ।

—নিজের ভুল!

—হ্যাঁ। হিন্দুর ছেলে, হিন্দুর পোশাকে এলে ভুলটা হত না। পাছে বিধর্মীর ছোঁয়ায় মন্দির অপবিত্র হয়, বিগ্রহ ধ্বংস হয়—সেই ভয়ে বিগ্রহ নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছেন তাঁরা।

দেবানন্দ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

জনশ্রুতি, দেবানন্দ দত্তের নাম থেকেই দেবানন্দের ক্ষুদ্র জনপদটির নতুন নামকরণ হয় দেবানন্দপুর। প্রসঙ্গত বলা দরকার, এ সেই দেবানন্দপুর যেখানে বাংলা সাহিত্যের বরেণ্য কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

ছবি সুদীপ্ত মণ্ডল

পত্র ভারতী প্রকাশিত
বয়স্ক পাঠকের জন্য
মানবিক মেগা
উপন্যাস
কলিকাতায়
নবকুমার

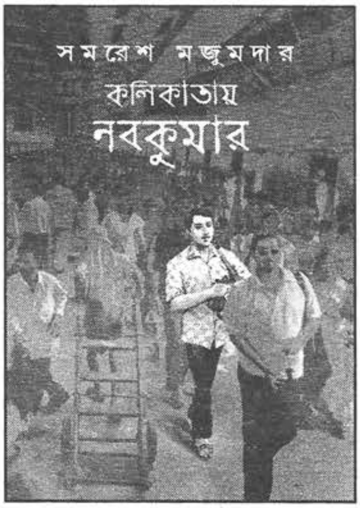

উত্তরবঙ্গের সৎ চরিত্রবান যুবক
নবকুমার রোজগারের অন্বেষণে
কলিকাতায়...
তার চোখের সামনে
লালবাতি পাড়ার জীবনযন্ত্রণা...
যাত্রপাড়া, টলিউড...
নবকুমার কি হিরো হবে? তার কাছে
কলিকাতা কি হবে কলকাতা?
সমরেশ মজুমদার

সমরেশ মজুমদার

মুশকিল আসান

আগে যা ঘটেছে

কদমতলার মোড়ে অসুস্থ মানুষটাকে নিয়ে আসা হল চৌধুরী মেডিক্যালস স্টোর্সে। মানুষটা একটু সুস্থ হতে জানা গেল বানারহাট থেকে আসার সময় বাসে তাঁর চল্লিশ হাজার টাকা পকেটমারি হয়েছে। আটত্রিশ-এ-তে একসময় বঙ্কার দল পকেটমারি করত। বঙ্কা তিনবার জেল খেটে সন্ন্যাসী হয়েছে। তবে তার আগে বেশ কিছুদিন জল্পেসের পাগলাবাবার কাছে যাতায়াত করত। অর্জুন জল্পেসে গিয়ে জানতে পারে এই পাগলাবাবা আসল নন। আসল অনেকদিন আগে মারা গেছেন। ইনি নাকি মাঝেমধ্যে মৌনী হন। সেখানে হরিমাস্টার নামে এক ভদ্রলোকের কথা শোনে অর্জুন, যিনি বছরপাঁচেক আগে আশ্রমে আসা ছেড়ে দিয়েছেন। অর্জুন হরিমাস্টারের সঙ্গে দেখা করে। জানতে পারে আশ্রমে ইদানীং বহু ধনী লোকের যাতায়াত বেড়েছে। এদের মধ্যে বাংলাদেশিও আছে। এখনকার পাগলাবাবার মৌনী হওয়াটা একটা ছল, আসলে এর মাধ্যমে তিনি নিজেকে লোকচক্ষুর আড়ালে নিয়ে যান। যা হরিমাস্টার মেনে নিতে পারেননি। পরদিন সকালে অর্জুন থানার বড়বাবুর একটি ফোন পেয়ে থানায় যায়। সেখানে সাতজন ধুরন্দর পকেটমারকে ধরে আনা হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন—নিরাপদকে অর্জুনের সন্দেহ হয়। কিন্তু নিরাপদকে জেরা করার আগেই জলপাইগুড়ির ধুরন্ধর উকিল মহাদেব মিত্র ওকে জামিনে ছাড়িয়ে নিয়ে যান। অর্জুন হাসপাতালে গিয়ে অসুস্থ ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা করে। তাঁর শরীরের খোঁজখবর করার পর জানিয়ে আসে কেউ যদি তাঁর হারিয়ে যাওয়া টাকার পরিমাণ জানতে চায়, তবে তিনি যেন বলেন তাঁর ষাট হাজার টাকা পকেটমারি হয়েছে। এদিকে দেবী চৌধুরানির মন্দিরের ভেতর নিরাপদকে কেউ খুন করে রেখে যায়। অর্জুন তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে জানতে পারে এক ভদ্রলোক নিজেকে থানার সাবইনস্পেক্টার পরিচয় দিয়ে টাকার পরিমাণটা জেনে গেছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে অর্জুন শোনে বড়বাবু কাউকে হাসপাতালে পাঠাননি। মন্দিরের পুরোহিতের থেকে জানা যায় মাসখানেক আগে একজন লোকের সঙ্গে নিরাপদ মন্দিরে এসেছিল। সেদিন সেখানে দুজন ভক্তের পকেটমারি যায়। যখন সবাই হইচই করছিল তখন মন্দিরে যে পাগল থাকে সে পঞ্চা-পঞ্চা বলে চিৎকার করে উঠেছিল। পুলিশ-মেসের রান্নার ঠাকুর বলে পঞ্চু না কি খুব গাঁজা খায়। থানার বড়বাবু আর অর্জুন দুজনে মিলে রান্নার ঠাকুরকে চেপে ধরে জানতে পারে তিস্তার ব্রিজের কাছে একটা গোপন গাঁজার ঠেক আছে, যেখানে দাগি আসামিরা যায়। অর্জুন ফাঁদ পাতল। ঠাকুরের মাধ্যমে চাউর করে দিল মন্দিরের পাগলটা না কি পঞ্চুকে খুন করতে দেখেছে। কাজ হল বুদ্ধিতে। ওই রাত্রেই পাগলকে খুন করতে এসে অর্জুনের পাতা ফাঁদে ধরা পড়ল দুজন। যার মধ্যে একজন পঞ্চু। অর্জুন বাড়ি ফিরে জানতে পারে এক ভদ্রলোক দু-বার ফোন করে তার মাকে ভয় দেখিয়েছে। যাতে অর্জুন এই কেস থেকে সরে যায়। থানায় গিয়ে দেখে আবার মহাদেব মিত্র এসেছেন। এবার তার ক্লায়েন্ট শ্রীমান পঞ্চানন। কিন্তু এবার পঞ্চানন তাঁর সঙ্গে যেতে অস্বীকার করে। কারণ, অর্জুন নিরাপদর জামিনে ছাড়া পাওয়ার পরের পরিণাম তাকে মনে করিয়ে দেয়। অর্জুন পঞ্চাকে বলে, যদি বাঁচতে চাও, আমাদের নিরাপদর খুনির নাম বলো। পঞ্চা চাপে পড়ে বলে, লোকটার নাম জানা নেই। লোকে ওকে ওস্তাদ বলে ডাকে, মধু ড্রাইভারের সঙ্গে আসে। অর্জুন ঠিক করে একবার সেই গাঁজার ঠেকে যাবে। ছদ্মবেশ নিয়ে অর্জুন পঞ্চার সঙ্গে গাঁজার ঠেকে যায়। একজন মোটা ষণ্ডা গোছের আর একজন রোগা লোক সেখানে আসে। অর্জুন দেখে ঠেকের ছেলেটা লোকদুটোকে বেশ খাতির করছে। পঞ্চা যখন নেশায় টইটুম্বুর মোটা লোকটা তাকে দেখে অবাক হয়। এটা-সেটা জিগ্যেস করে বলে, পরদিন সকাল আটটায় দেখা করতে। বেরোবার সময় পঞ্চার বুড়ো বলে এক ড্রাইভারের সঙ্গে দেখা হয়। সেও পঞ্চাকে দেখে অবাক হয়ে বলে তুমি কিছুদিন গা-ঢাকা দাও। নইলে বিপদ আছে। তারপর...

॥ পনেরো ॥

পঞ্চা ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাল। যেন কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না।

অর্জুন আবার জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা কারা?'

'ওই যে বলল? কী যেন বলল! আমার এখন ঘুম পাচ্ছে।' হাই তুলল পঞ্চা।

অর্জুন বুঝতে পারল এখন ওর পক্ষে হেঁটে বাড়ি চিনে যাওয়া সম্ভব হবে না। ওকে পাণ্ডাপাড়ায় ফেলে রেখে যেতে মন চাইছিল না। সে পঞ্চার হাত শক্ত করে ধরে বলল, 'জোরে পা ফেলে হাঁটো নইলে ওরা তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে।'

'ধরে নিয়ে যাবে?' পা ফেলল পঞ্চা, 'কারা?'

যাচ্চলে! অর্জুন হাঁটতে-হাঁটতে মাথা নাড়ল, এ তো এখন তার কাছেই জানতে চাইছে! কিছুদূরে যেতেই রাস্তার পাশে একটা জিপকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল অর্জুন। কাছে যেতে বুঝতে পারল ওটা পুলিশের জিপ। তাদের দেখে দুজন খাকি পোশাকের লোক নেমে এসে চিৎকার করল, 'অ্যাই? কে তোরা? এগিয়ে আয়!'

অর্জুন বুঝতে পারল তার ছদ্মবেশ ধরতে পারেনি পুলিশ।

কাছে এসে অর্জুন বলল, 'আমরা বাড়ি যাচ্ছি।'

'এই ভিজে কাকটা কে? মাল খেয়ে ডোবায় পড়েছিল মনে হচ্ছে। তুমি কে? কোথায় বাড়ি?' যে লোকটা এগিয়ে এল সে পুলিশের অ্যাসিস্টেন্ট সাব ইন্সপেক্টর।'

'আমি কাছেই যাব। আর এ মদ খায়নি, গাঁজা খেয়েছে।'

'গাঁজা? সর্বনাশ! সেটা তো আরও বেআইনি, ওঠো, ওঠো জিপে। থানায় নিয়ে গিয়ে ভালো করে রগড়ালে হয়তো কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরুবে। এই তোল ওদের?' আদেশ দিতেই দ্বিতীয় পুলিশ টানতে-টানতে ওদের ভ্যানে তুলল।

অর্জুন স্বস্তি পেল। যাক, পথটা হাঁটতে হল না পঞ্চাকে নিয়ে। যে পুলিশটা তাদের ভ্যানে তুলছিল সে অর্জুনকে ফিসফিস করে বলল, 'কেন ঝামেলা বাড়াচ্ছেন?'

'কী করব?' অর্জুন জিজ্ঞাসা করল।

'একশোটা টাকা দিয়ে বাড়ি চলে যান। থানায় গেলে বহুত হুজ্জত। কাল কোর্টে নিয়ে গেলে সাতদিন জেলের ভাত খেতে হবে।' লোকটি বলল।

'অত টাকা তো নেই।' অর্জুন বলল।

'ওর কাছে?'

'দূর! সব শেষ করেছে গাঁজা খেয়ে।'

লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে সরে বসল।

থানার সামনে জিপ দাঁড়ানোমাত্র এ এস আই হাঁকলেন, 'খাঁচায় ঢোকাও ওদের।'

নিজেকে ছদ্মবেশ মুক্ত করল অর্জুন। তারপর এ এস আই-এর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটা যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'একী! আপনি? আমি একদম বুঝতে পারিনি স্যার। এত রাত্রে বেসামাল লোক দেখলে তাকে থানায় ধরে নিয়ে আসাই নিয়ম, তাই, মানে, ছি ছি ছি!' হাত জোড় করলেন এ এস আই।

অর্জুন থানার দিকে তাকাল। ঘুম-ঘুম ভাব সর্বত্র। নিশ্চয়ই বড়বাবু এখন থানায় নেই। সে বলল, 'ওকে রাত্রে থাকার ব্যবস্থা করে দিন। পারলে একটু খাবার দেবেন। আমি কাল সকালে আসব। তার আগে ও যেন চলে না যায়।'

সেই সেপাই পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। সঙ্গে-সঙ্গে সে বলে উঠল, 'আপনি কোনও চিন্তা করবেন না স্যার। আপনি যেমন বলবেন তেমন হবে।'

পঞ্চুকে এ এস আই ভেতরে নিয়ে গেলে সেপাই হাত জোর করল, 'ক্ষমা করে দেবেন স্যার। না বুঝে বলে ফেলেছি। পাতি মাতাল ধরে আনলে বহুত ঝামেলা হয়, তাই—।' অর্জুন কোনও কথা না বলে থানার চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে এল।

মা দরজা খুললেন। বোঝা-ই যাচ্ছিল এখনও ঘুমাতে যাননি। বহুবার বলা সত্ত্বেও ছেলে বাড়িতে না ফেরা পর্যন্ত মা জেগেই থাকবেন। অর্জুনের চাবি হারিয়ে ফেলার বদভ্যাস আছে। মাকে কষ্ট দেবে না বলে মাঝে চাবি নিয়ে বেরুত সে। দু-দুবার চাবি হারানোর পর মা রাগারাগি করে বন্ধ রেখেছে।

খুব খিদে লেগেছিল। মা খাবার দেওয়ার পর অর্জুন খুশি হল। আজ মাছ-মাংস নেই কিন্তু রুটি-ডাল-সবজির সঙ্গে এক বাটি পায়েস আছে। সে খাওয়া শুরু করলে মা বললেন, 'একটা ভালো খবর আছে।'

'কী?'

'হাবু এসেছিল।'

'হাবু!' অনেকদিন হাবুর খবর নেওয়া হয়নি। একটু খারাপ লাগল অর্জুনের, 'কী বলল? ওর শরীর ঠিক আছে তো?'

'আমি তো ওর ইশারার অর্ধেকটাই বুঝতে পারি না। যেটুকু বুঝেছি তা শুনলে তুই চমকে যাবি। আর-একটা রুটি দিই?'

'না। চটপট বলে ফ্যালো, কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছে।' অর্জুন তাকাল।

'অমল সোম আজ বিকেলে ফিরে এসেছেন।' মা হাসলেন।

'অ্যাঁ?' চিৎকার করল অর্জুন। অমলদা ফিরে এসেছেন?'

'তাই তো ইশারায় বলল।'

'তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছ তো?'

'আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম আজ ফিরেছেন? ও মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।'

অর্জুন ভাবতেই পারছিল না। অমল সোম জলপাইগুড়ি ছেড়ে গেছেন বেশ কয়েক বছর আগে। হিমালয়ের কোন শহরে ছিলেন। মাঝে দু-একটা চিঠি দিয়েছিলেন কিন্তু তাতে ওঁর ঠিকানা ছিল না। মেজরের সঙ্গে অমল সোমের যোগাযোগ আছে। অর্জুনের সত্যসন্ধানের হাতেখড়ি ওঁর কাছে। কিন্তু প্রচলিত জীবনযাত্রা তাঁর কাছে আর ভালো না লাগায় লোকচোখের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর হাকিম পাড়ার বাড়ি দেখা শোনা করে বহু পুরোনো কাজের লোক হাবু। সে কথা বলতে পারে না। একসময় গায়ের জোর ছিল খুব। কিন্তু এখন হাবু বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছে। সেই অমলদা জলপাইগুড়িতে ফিরে এসেছেন। অর্জুনের ইচ্ছে হচ্ছিল এখনই ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতে। কিন্তু রাত অনেক হয়ে গেছে। নিয়ম মেনে চলা মানুষ অমল সোম নিশ্চয়ই এখন ঘুমোচ্ছেন।

খাওয়া শেষ করে সে মাকে বলল, 'কাল একটু সকাল-সকাল ডেকে দিও তো।'

বিছানায় শুয়ে সে কেসটা নিয়ে ভাবছিল। আজ গাঁজার আড্ডায় গিয়ে তেমন কিছু লাভ হল না। যে লোকদুটো ওখানে এসে খাতির পেল তাদের পরিচয় জানা যায়নি। জানতে চাইলে ফিরে আসা হয়তো সম্ভব হত না। কিন্তু পঞ্চাকে দেখে অল্পবয়সি ড্রাইভার ছোকরা যার নাম বুড়ো, বলেছিল, ভালো কথা বলছি, ক'দিন গা ঢাকা দাও। বস্ খুব খেপে গিয়েছে তোমার ওপরে।' সে আরও বলেছে যে ড্রাইভারি করে বটে কিন্তু কান বন্ধ রাখে না। তার মানে ছেলেটার

কাজ শুধু গাড়ি চালানো। কিন্তু গাড়ির ভেতরে যেসব কথা হয় তা শোনে। দলের লোক হলে পঞ্চাকে পালাবার উপদেশ দিত না।

তাহলে একেবারে লাভ হয়নি তা বলা যাচ্ছে না। ওই ছেলেটাকে ধরলে নিশ্চয়ই জানা যাবে বস্‌ লোকটি কে? গাঁজার আড্ডায় না গেলে এই সূত্রটা পাওয়া যেত না।

সকালে মা ডেকে দিতেই চা খেয়ে লাল বাইকটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অর্জুন। এখনও জলপাইগুড়ির আকাশে রোদ ওঠেনি, চারধারে আলস্য মাখামাখি। থানার পাশ দিয়ে করলা নদীর গা ধরে যেতে-যেতে দেখল অনেকে মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছে। করলা ব্রিজের ওপর উঠে এল সে। একজন মর্নিং ওয়াকার জগিং করতে-করতে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে-যেতে দাঁড়িয়ে গেল। অর্জুন একবার পেছনদিক থেকে দেখে বাইক চালাল।

অমল সোমের বাড়ির গেটে পৌঁছে অর্জুন দেখল হাবু সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখতে পেয়ে একগাল হাসল হাবু। অর্জুন জিজ্ঞাসা করল, 'অমলদা এসেছেন?'

হাবু হাসতে-হাসতে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'ঘুমোচ্ছেন নাকি?'

মাথা নেড়ে না বলল হাবু। তারপর হাফ প্যান্ট পরা শরীরটা জগিং-এর ভঙ্গিতে নাচাল।

অমলদা ভোরে জগিং করছে? বাইক থেকে নেমে নিজেকেই প্রশ্নটা করল সে। যাচ্চলে, আগে তো এরকম করতে সে দ্যাখেনি। বাইকটা ভেতরে ঢুকিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে সে দেখল জগিং স্যুটটাকে। করলা ব্রিজের ওপরে এই স্যুটটাকেই দেখেছিল সে। এখন মুখের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করল অর্জুন, 'আরে অমলদা, আপনাকে আমি চিনতেই পারিনি!'

মাথা থেকে টুপিটা খুলতেই অর্জুন দেখল সেখানে চমৎকার টাক গজিয়ে গেছে।

'তুমি আমাকে এক্সপেক্ট করনি তাই চেনোনি। তবে আমার মুখ কি পালটেছে।'

'হয়তো টুপিটা থাকায়—।' অর্জুন হাসল, 'কাল রাত্রে মায়ের কাছে খবরটা শুনে খুব খুশি হয়েছি। যাক, শেষপর্যন্ত আপনি ফিরে এলেন।'

'ভেতরে চলো। চা খাওয়া যাক। হাবু, দু-কাপ চা, ভালা করে।'

হাবু দৌড়ল ভেতরে।

বারান্দায় বেতের চেয়ারে অমলদা বসতে অর্জুন অন্য চেয়ারটি দখল করল। অমল সোম আগের থেকে অনেক রোগা হয়েছেন। গায়ের রং আরও ফরসা হয়েছে।

'তোমার খবর কী? চাকরিবাকরি করছ?'

'না।'

'তার মানে তুমি পুরোপুরি প্রফেশন্যাল ইনভেস্টিগেটর। গুড। কিন্তু এই ছোট্ট শহরে বসে কেস পাচ্ছ? তাতে সংসার চলছে?' অমল সোম জানতে চাইলেন।

'মোটামুটি চলে যাচ্ছে।' অর্জুন বলল।

'দ্যাটস গুড। মা কেমন আছেন?'

'ভালো। অমলদা এখন এখানে থাকবেন তো?'

'নাহে, ডাক্তাররা বলছেন সমুদ্রের ধারে গিয়ে থাকতে। সামুদ্রিক বাতাস নাকি আমার শরীরকে চাঙ্গা করবে। সে যাহোক, এই বাড়িটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। হাবুটার বয়স হয়েছে। ওর পক্ষে আর ওই বাড়ি আগলে পড়ে থাকা সম্ভব নয়। ওকেও তো বলতে পারি না কোথাও চলে যেতে। আমি যেখানে থাকব সেখানেই থাকবে সে।' বলতে-বলতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল অমল সোম।

'সোজা কথায় এবার আপনি এসেছেন বাড়িটাকে বিক্রি করে দিতে। তাই তো।'

'হ্যাঁ ভাই, আর-একটা বসতি করতে তো টাকার দরকার হবে।'

হাবু চা নিয়ে এল। কিন্তু মনটা খিঁচড়ে গেল কথাটা শোনার পরে। এই বাড়ি আর হাবু থাকায় মনে হত অমল সোম ফিরে এলেও আসতে পারেন। কিন্তু বাড়ি বিক্রি হয়ে গেলে তো চিরকালের জন্যে হারাতে হবে ওঁকে।

চা খাওয়া শেষ হলে অমল সোম জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন হাতে কোনও কেস আছে?'

অর্জুন মাথা নাড়ল, 'যেটা আছে তার সঙ্গে আমি জড়িয়ে গেছি। কেউ এসে বলেনি আমার এই কেস আপনি সমাধান করে দিন।'

'তার মানে প্রাপ্তিযোগ নেই?'

'বানারহাট থেকে এক ভদ্রলোক মেয়ের বিয়ের বাজার করতে জলপাইগুড়ি আসছিলেন। নিম্নবিত্ত মানুষটির চল্লিশ হাজার

টাকা বাসের ভেতর পকেটমার নিয়ে নেয়। ভদ্রলোক ভেঙে পড়েন, মৃদু হার্ট অ্যাটাক হয়। হাসপাতালে ভরতি হয়ে আছেন। আমার মনে হল ওর মেয়ের বিয়ের জন্যে টাকাটা উদ্ধার করা দরকার।'

'করতে পেরেছ?'

'এখনও না। পকেটমারের সন্ধান করতে গিয়ে বিশাল চক্রের সন্ধান পেয়ে গেছি। কিন্তু এখনও আশার আলো দেখছি না।'

'আমি খুশি হলাম তুমি টাকার কথা না ভেবে মানুষের উপকার করার চেষ্টা করছ বলে। তার মানে তুমি পালটাওনি।' অমল সোম বললেন।

অর্জুন যা-যা ঘটেছে তা সংক্ষেপে বলল।

সব শোনার পর অমল সোম জিজ্ঞাসা করলেন, 'জল্পেশের পাগলাবাবা এখনও বেঁচে আছেন? না, সেটা তো সম্ভব নয়, আর যদি বেঁচে থাকেন তাহলে জেনো তিনি কখনওই অপরাধকে প্রশ্রয় দেবেন না।'

'আসল পাগলাবাবা বেঁচে নেই। এখন তাঁর শিষ্য আছেন। মাঝে-মাঝে যখন মৌনব্রত অবলম্বন করেন তখন কাউকে দর্শন দেন না। ওঁর একসময়ের ভক্ত হরিমাস্টার সন্দেহ করেন সেই সময় এই দ্বিতীয় পাগলাবাবা আশ্রম থেকে উধাও হয়ে যান।'

'তাই বলো। ঠিক আছে, যা শুনলাম তোমার কাছে তা মাথায় রইল। যদি কোনও প্রশ্ন মনে আসে, তাহলে জিজ্ঞাসা করব।' অমল সোম বললেন।

'অর্জুন উঠে দাঁড়াল, 'বিকেলে বাড়িতে থাকবেন?'

'দুপুরে একটু বেরুব। চারটের মধ্যেই ফিরে আসব।'

রোদ্দুর উঠে গেছে। থলে হাতে বাজারে ছুটছেন মানুষজন। অর্জুন বাইক চালিয়ে সোজা থানায় চলে এল। এসে শুনল বড়বাবু তাঁর ঘরে আছেন। জরুরি মিটিং হচ্ছে। অর্জুন অপেক্ষা করল। মিটিং শেষ হলে অন্য অফিসাররা বেরিয়ে যেতে অর্জুন ঘরে ঢুকল, 'বুঝতে পারছি খুব ব্যস্ত, পাঁচটা মিনিট নষ্ট করতে পারি।'

বড়বাবু হাসলেন, 'আসুন, আসুন।'

'আপনি এই সময়ে থানায়?'

'ভোরের তিস্তা-তোর্সায় ডাকাতি হয়েছে। চারজন ডাকাত জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের একটু আগে চেন টেনে নেমে শহরে ঢুকেছে। খবর পাওয়ামাত্র ছুটেছিলাম। এখনও ধরা পড়েনি কেউ। ওই নিয়ে কথা বলছিলাম এতক্ষণ। বলুন, আপনি এখানে, এই সময়ে?'

গতরাতের গাঁজার আড্ডার খবরটা দিয়ে অর্জুন বলল, 'ওই ছোকরা ড্রাইভার বুড়োকে আমাদের দরকার। ওর কাছে পাণ্ডার হদিস পাওয়া যাবে।'

বড়বাবু একজন এ এস আইকে খবর পাঠালেন। তিনি এলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি বুড়ো নামের অল্পবয়সি কোনও ড্রাইভারকে চেনেন?'

'ঠিক মনে করতে পারছি না। নিশ্চয়ই প্রাইভেট চালায়। খোঁজ নিচ্ছি।' এ এস আই চলে গেলে পঞ্চুকে নিয়ে আসা হল। অর্জুন তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাকে আজ আটটার মধ্যে গাঁজার ঠেকের মাস্তান দেখা করতে বলেছিল। আটটা বাজতে চলল। যাবে না?'

দুদিকে মাথা নেড়ে পঞ্চু বলল, 'না।'

ছবি সৌরীশ মিত্র

[চলবে]

আগামী আগস্ট ২০০৮

কিশোর ভারতী

প্রচ্ছদকাহিনি

লঙ্কা কাণ্ড

নানাস্বাদের গল্প লিখেছেন

মনোজ সেন

গৌতম দাশ

সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সঞ্জয় মিত্র

প্রসূন চক্রবর্তী

এবং...

গোয়েন্দা অর্জুনকে নিয়ে চলছে

সমরেশ মজুমদারের ধারাবাহিক

মুশকিল আসান

শিবরাম চক্রবর্তী-র নতুন রঙিন কমিকস

হর্ষবর্ধনের বিড়ম্বনা

নারায়ণ দেবনাথ-এর **নন্টে-ফন্টে**

এছাড়া আরও ৩ কমিকস

হরে কর কম

খেলা, কোথায় কী আশ্চর্য, হা-হা হি-হি, চাই চাই না, ভালো থেকো, তোমাদের কথা, যাচ্ছি, বিজ্ঞান, তোমাদের দপ্তর, কুইGK

এবং নিয়মিত সব বিভাগ

কল্যাণ মৈত্র

লকা

লকা বাতাবি লেবু গাছে। পা নাচাচ্ছে। হঠাৎ দেখল রাস্তার ধারে ভাঙা পাঁচিলের ওপর দিয়ে কোথায় যাচ্ছে ফচকে। ওকে দেখে লকা গাছের ওপর থেকেই বলল,—এই ফেবিকল কোথায় চললি রে?

লকা আজ ফচকে-কে আদর করে ফেবিকল বলে ডাকল। তার কারণ অবশ্য অন্য। ফচকে ইদানিং সুযোগ পেলেই পালটি খায়। যার-তার সঙ্গে সেঁটে যায়—ঠিক ফেবিকলের মতো। লকা খেয়াল করছে ইদানিং ফচকে তাকে অ্যাভয়েড করছে। দেখেও যেন দেখে না। লকা জানে কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে। তা ছাড়া এই সকালে ফচকে চলল কোথায়?

লকা বলল,—একটা কথা ছিল। সেইটা পেয়েচি—।

ফচকে আড়চোখে লকাকে দেখল। লকার দু-আঙুলের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে—কালো একটা মার্বেল। প্রেসাস্।

ফচকে ফিক করে এক চিলতে হাসি মেরে বলল,—এখন ব্যস্ত...পরে হবে।

ফচকে এমন দামি একটা টোপ না গেলায় লকা একটু অবাক হল বইকি।

আবার বলল,—থাকবে না কিন্তু... ভালো দাম পেলে ছেড়ে দেব।

দাম মানে ফ্রি-তে কেক, ক্রিম-বিস্কুট বা কাঁচামিঠে আম—লকার যা-যা পছন্দ আর কী!

ফচকে ততক্ষণে পাঁচিল ডিঙিয়ে রাস্তায়। তাড়া ছিল সত্যি! ছোটমামি পেঁয়াজ আনতে দিয়েছে একটাকা চার আনার। দু-চার পয়সা কমাতে পারলে পকেটে আসবে।

আজ শনিবার। স্কুলে হাফ ছুটি। ফচকে আজ যাবে না। পণ্ডিতস্যারের সংস্কৃত পড়া হয়নি। ওই খটমটে ভাষাটা কিছুতেই ট্যাকল করতে পারছে না ফচকে। সেকেন্ড পিরিওডেই পণ্ডিতস্যার। সাক্ষাৎ যম। ছেলেরা বলে 'নর, নরৌ, নরা—নয়তো বেঞ্চির ওপর দাঁড়া। সামনে রয়েছে ফাঁড়া—তার চেয়ে ভালো কেটে পড়া।'

পণ্ডিতস্যার ক্লাসে ঢুকেই বলবেন,—এই ফচকে জল নিয়ে আয় এক ঘটি।

কোনও দিন ফচকের ব্যাড লাক থাকলে, বঙ্কা (ভালো নাম বোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়) জল—কুইক্। সেদিন ফচকের হাত লাল। পণ্ডিতস্যারের বেত ঢাকের কাঠির মতো হাতে পড়বে,—মাথায় শুধু গোবর—তোর যে কী হবে! ওই লকার পাল্লায় পড়ে তুই গোল্লায় গেলি।

পেতলের ঘটি থেকে ঢকঢক করে জল খেয়ে পণ্ডিতস্যার ডান হাতে লিকলিকে বেতটা নাচিয়ে বলবেন,—সুক্তিরত্নাবলীর প্রথম চারটে শ্লোক বল।

কিন্তু কোথায় ফচকে বা বঙ্কা! তারা সরে পড়ছে। পেছনের বেঞ্চে বসে ছিল। পেছনের ভাঙা জানলা দিয়ে পগার পার।

পণ্ডিতবাবু অপমানিত। ক্লিন বোল্ড। ফচকে হাওয়া, হারু, পঞ্চুও নেই। লাল-লাল চোখ করে পণ্ডিতস্যার বললেন,—সন্তু নামগুলো সব লিখে ফেল। রোল কলের পর কারা-কারা কেটে পড়েছে দেখ। হেডস্যারকে দিতে হবে। আড়ং ধোলাই না হলে ব্যাটারা সিধে হওয়ার নয়।

ফচকে ততক্ষণে মিত্তিরদের বাগানে। স্কুলের পাশেই মিত্তিরদের বাগান—লোকে বলে ফণিবাবুর অভয়ারণ্য। সকালে স্কুলের নটোরিয়াস ছেলের দল, রাতে চোর-চোট্টা গুণ্ডারা দখল নেয়। বাগানে আম, কামরাঙা, জাম, শিরিশ, বাতাবি, কাঁঠাল গাছ প্রচুর। ছোট্ট একটা পুকুরও আছে। নারকেল গাছের সারি দিয়ে ঘেরা।

—কে কাকে আড়ং ধোলাই দেয় দেখা যাক! উত্তেজিতভাবে কথাটা বলল লকা। সে পণ্ডিতমশায়ের ক্লাসে ছিল না। তবুও। পুকুর পাড়ে বসে কোঁচো খুঁজছিল—ভাঙা ইটের তলায় লুকিয়ে আছে টোপ। ধরো, কাটো আর গেঁথে দাও বঁড়শির ডগায়।

ফচকে এসে হাঁফাতে থাকে।—ও! যা বাঁচা বেঁচেছি, সে কী বলব লকাদা।

লকা বঁড়শিটা সুতো সুদ্ধু একটু দুলিয়ে

জলে ছুঁড়ে দিল। ফচকের দিকে না তাকিয়েই বলল,—লোকটা বড্ড জ্বালাচ্ছে না রে! ওর জন্য তো আমি স্কুলে যাওয়াই প্রায় ছেড়ে দিয়েছি। পঞ্চাননবাবুর ইংরেজি ক্লাস—কীসব বলেন বোমবাস্টিং, বুঝতে পারি না। সত্যবাবুর জ্যামিতি—সমকোণ, লম্ব, সম্পাদ্য, উপপাদ্য কিছু ঢোকে না। ঘষা কাচের মোটা চশমার ফাঁক দিয়ে সত্যবাবু তাকালে মনে হয় পেটের মধ্যে নাড়ি ধরে কেউ টানছে!... আর ওই এক হয়েছে—হেডস্যারের চামচা পণ্ডিত দুর্গাচরণ ভট্টাচার্যি। লোক বটে একটা। এগুলো মাস্টার, না জল্লাদ? সেদিন ওই যে ছেলেটা, কী যেন নাম—আরে 'দাদুর নাতি'। ওহ্ হ্যাঁ, ঋতব্রত। কী ঠ্যাঙানিই না খেল। ওর দাদু এসে নিয়ে গেল ওকে—দশ দিন স্কুল কামাই। অথচ ঋতব্রত কীরকম শান্ত, ভালো ছেলে। সাত চড়েও রা-কারে না।

ফাতনা নড়ছে। লকা শ্যেন দৃষ্টিতে এতক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে ছিল। ফাতনাটা মুহূর্তের মধ্যে জলে ঢুবল—লকা মারল টান। আর ঠিক সেই সময়েই পুকুর পাড়ে এসে হাজির হরিপদ। হরিপদ হাওলাদার। লকারা ওকে খ্যাপানোর জন্য কখনও-কখনও হরিবোল বলেও ডাকে। হরি এতক্ষণ ক্লাসে ছিল। লকার টান একটু জোরে হয়েছে—মাছ বঁড়শি ছিড়ে হাওয়া। লকার মেজাজ খিচড়ে গেল। হরি এসে বলল,—পণ্ডিতস্যারের কথা মতো লিস্ট তৈরি হয়েছে। কারা-কারা পেছনের জানলা দিয়ে ক্লাস পালিয়েছে আজ, তাদের নাম হেডস্যারের কাছে যাবে। গার্জেন কল।

তারপর ফচকের দিকে তাকিয়ে হরি বলল,—তোর নাম প্রথমেই।

ফচকে আঁতকে উঠল যেন,—কী হবে তাহলে লকাদা?

লকা গম্ভীর মুখে খানিকটা চিন্তা করল। পুকুর পাড়ে ফলসা গাছ তলায় পায়চারি করতে থাকল। তারপর বলল,—ঘাবড়াসনি। কাল আমি স্বয়ং আবির্ভূত হব। একটা আইডিয়া খেলেছে মাথায়।

হরি বলল,—মনিটর ফটিক আর-একটু পরেই তো এদিক দিয়ে বাড়ি ফিরবে—অ্যাটাক করব? ব্যাটা ফচকের নাম, আমার নাম লিস্টে ইনক্লুড করল কেন?

লকা বলল,—প্রতিশোধ নিচ্ছে। সেদিন ফটিকের টিফিন চুরি হয়েছিল—তার আগের দিন পকেট থেকে ডাঁসা একটা পেয়ারা বের করে নিয়েছি—তাই আর কী! ফচকে তো আমার দলে, তাই টাইট দিচ্ছে।

ফটিক আর হরির সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। হরি সেদিন ফটিকের থেকে তাল পাটালি চেয়েও পায়নি। অথচ দেওয়ার মতো ছিল। ফটিক অন্যান্য বন্ধুদের দিচ্ছিল ভেঙে-ভেঙে। এই কিছুদিন আগেও হরি, ফটিক, চিনু সব একসঙ্গে স্কুলে আসত টিন বাজার দিয়ে। চাচার দোকানে হাত পেতে মৌরি নিত। তারপর চিবোতে-চিবোতে স্কুলে পৌঁছে যেত। ফটিক হঠাৎ ভালো ছেলে হয়ে গেছে, হরিদের সঙ্গে নেয় না। চারটে মাস্টার দিয়েছে ওর বাবা। ফটিক হাওয়াই চপ্পলের জায়গায় কেটস পরে—স্যান্ডুইচ আনে টিফিনে। লোভ হয়। ফটিকের দেখাদেখি অন্যরাও টিফিন আনা শুরু করেছে। এখন আর ওরা রহমতের বাবার বেকারি থেকে চার আনার তিনটে টোস্ট বিস্কুট খায় না। ঝালমুড়ি এমনকি আলুকাবলিও না। হরি জানে, ফটিক খুব সেয়ানা। সেদিন ওর আইসক্রিমে পরপর বেশ কয়েকবার চুষে দিয়ে গেল। নুনঝাল দিয়ে আইসক্রিম খাচ্ছিল হরি। ফটিক এসে ভাগ বসাল। হরি ভাবল বিরোধ মিটিল বোধহয়। কিন্তু কোথায় কী!!

হরি তাই চাইছিল ফটিককে একটু কড়কে দিক লকা। লকা বলল,—নো অ্যাট্যাক। সোজা আঙুলে নয়, ব্যাঁকা আঙুলে। ওকে পাশ করিয়ে দে। চলে যাক। কাল যা হওয়ার হবে।

লকা বাগানে থেকে গেল। হরি, ফচকে বাড়ি ফিরল। ওরা কিন্তু লকার প্ল্যানটা কী তা জানতে পারল না। লকা এসব ব্যাপারে সিক্রেট ফাঁস করে না।

পরদিন সকলেই হাজির ক্লাসে। ঘর একদম চাঁদের হাট। গমগম করছে। লকা একদম পিছনের বেঞ্চে বসে। পাশে ফচকে, হরি, সামনের দিকে বক্কা, চিনু ও অন্যান্যরা। ফার্স্ট, সেকেন্ড পিরিওড নির্বিঘ্নে গেল। বাংলা পদ্য তারপর ভূগোল। লকা এবার উঠে দাঁড়াল। বলল,—চিনু দরজার সামনে যা আর বারান্দার জানলার সামনে বক্কা গার্ড দে। কেউ এলে সতর্ক করবি।

তারপর একটু থেমে ফের বলল,—মনে রাখবি, এবার যা-যা হবে তার কেউ কিছু দেখেনি। কাউকে জানালে বা পরে চুকলি করলে ফলসা তলার আদালতে তার বিচার হবে। তখন আমাকে যেন কেউ দোষ দিও না।

এই বলে লকা লাফিয়ে বেঞ্চের ওপর দাঁড়াল। বলল,—ফ্যান নেভা

তারপর ফ্যানটার একটা ব্লেড চেপে ধরল বাঁ-হাতে। কী একটা বস্তু সেখানে। রেখে বলল,—এখন ফ্যান বন্ধ থাকবে। স্যার এলে খুলে দিবি।

পণ্ডিতস্যার এলেন। ক্লাসে পিন-ড্রপ সাইলেন্স।

কী ব্যাপার রে! আজ যে এত চুপচাপ তোরা।...বেশ বেশ—কাজ হয়েছে ওষুধে। আমি কি আর তোদের খরচ চাই রে!! কাল মিস্ত্রি এসে জানলা সারিয়ে দিয়ে যাবে। এটা তো ঠিকই—খোলা জানলা থাকলে পাখি তো পালাবেই। এই বলে পণ্ডিতস্যার ফচকের দিকে তাকিয়ে ফোকলা দাঁতে একটু হাসলেন।

হঠাৎ তাঁর চোখ গেল লকার দিকে। চশমাটা টেনে নাকের ডগায় এনে দেখতে লাগলেন—ঠিক দেখছেন তো? ভুরু কুঁচকে বলেন,—লকা না?

—হ্যাঁ স্যার!

—কী মনে করে আজ পদার্পণ? কী ভাগ্য আমাদের! আমি ভাবলাম পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিস।

—কী যে বলেন স্যার। পেট খারাপ ছিল তাই আসিনি ক'দিন।

—মিথ্যে বলছিস কেন লকা? তুই যে স্কুল কামাই করে মিত্তিরদের বাগানে সারাদিন ভূতের নৃত্য করিস তা কি আমরা জানি না। এবার বোর্ডে তোর নাম কে পাঠায় দেখি। টেস্টে পাশ না করলে, পড়ে থাকবে—এবছর থেকে এই নিয়ম করছে স্কুল।

লকা মাথা চুলকে বলল,—স্যার আপনার আশীর্বাদ পেলে পাশ কে ঠেকায়! আর কামাই হবে না স্যার! এবার থেকে মন দিয়ে পড়ব।

পণ্ডিতস্যার খুশি হলেন মনে হল,—যাক তাহলে শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে। তোর পাল্লায় পড়ে সব উচ্ছন্নে যাচ্ছিল।

তারপর ফচকের দিকে তাকিয়ে পণ্ডিতস্যার বললেন,—তুই মিটমিটে শয়তান ওখানে কী করছিস? পেছন দিকে বসতে বারণ করেছি না। সামনে বোস। ও হ্যাঁ, এক

ঘটি জল নিয়ে আয় কুইক!

বঙ্কা বলল,—স্যার গরম করছে না আপনার?

—সেকী রে! পাখা চালাসনি! তাই ভাবছি এত ঘাম হচ্ছে কেন? দে চালিয়ে দে।

পাখা ঘুরতেই লণ্ডভণ্ড কাণ্ড শুরু হল। পণ্ডিতস্যার একবার চোখ রগড়ান তো চারবার হাঁচেন। তিনিই বসেন ঠিক পাখার নীচে। সারা ক্লাস হাঁচছে। যেন হাঁচি-কাশি প্রতিযোগিতা চলছে। প্রথম বেঞ্চে যারা বসে ছিল তারা কেউ চোখ খুলতে পারছে না। সে এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। তিন টাকার এন সি নস্যির এত জোর!

পণ্ডিতস্যারের বোঝবার আগেই পুরো ব্যাপারটা ঘটে গেল যেন। ঘরময় নস্যির গন্ধ। বারান্দাতেও সে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। পাশের ক্লাস থেকে শিববাবু এসে দেখেন—পণ্ডিতস্যার মাটিতে পড়ে। হাঁচতে-হাঁচতে শুয়ে পড়েছেন। তাঁর পেট ব্যথা শুরু হয়েছে। ফচকে জল আনতে গিয়েছিল আর ফেরেনি। লকা উধাও। বঙ্কা চোখ রগড়াতে-রগড়াতে বলল,—স্যার জল খাবেন? আনব?

আর জল! পণ্ডিতস্যারের চোখ দিয়ে তখন জল গড়াচ্ছে। প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় বললেন,—আমি চলে যাব। এইরকম শত্রুতা কেউ করে?

ঘটনাস্থলে হেডস্যার এসে পড়েছেন। মারাত্মক অবস্থা। এ একেবারে ভ্যান্ডালিজম। শিববাবু, শ্যামলবাবু, ধরাধরি করে পণ্ডিতস্যারকে টিচার্সরুমে নিয়ে গেলেন। ফচকে আর লকা—দুজনকেই ধরে আনল স্কুলের দারোয়ান বালিয়া। বালিয়ার চেহারা শক্তপোক্ত। বিহারি মাসেল গায়ে। বাঁ-হাতে ফচকে ঝুলছে। তার ডান বগলে লকা আটকে আছে। লকাকে বালিয়া একটু চেপেই ধরেছিল। কিছুতেই আসবে না। আর বালিয়াও ছাড়বে না। লকা বলছিল,—ছাড়ো বলছি। নয়তো তোমাকে পরে দেখে নেব। আমার দাদা লালবাজারের ওসি—এমন কেস দেব না।

ফচকে চুপ করে আছে—যেন মরা মাছ।

টিচার্সরুমে ওদের নিয়ে আসা মাত্রই হইহই পড়ে গেল। সারা স্কুলের ছেলে সেখানে হাজির। লকা মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। বালিয়া চেঁচাচ্ছে—এ কেয়া হুয়া। উঠ্।

লকা মাটিতে চিত-পটাং। শরীরে কোথাও সাড় নেই। অজ্ঞান হয়ে গেছে মনে হয়।

হেডস্যার রেগে গিয়ে বালিয়াকে বললেন,—তোকে ধরে আনতে বললাম, বেঁধে আনলি! এখন কী হবে বলত?

শিববাবু লকার বুকের ওপর মাথা রাখলেন—না, বুকের আওয়াজ কম। হার্ট চলছে না ঠিক মতো। অসিতবাবু পালস্ দেখতে চেষ্টা করলেন লকার ডানহাত ধরে—সেটা নেতিয়ে পড়ল।

—মরে যায়নি তো! একটি ছেলে বলল ভিড়ের মধ্যে থেকে। আর তা শোনামাত্র হেডস্যার আর অপেক্ষা করতে চাইলেন না। গলা তুলে বললেন,—ডাক্তার ডাক। বালিয়া, যেখান থেকে পাড়িস ডাক্তার নিয়ে আয়। দুজনকেই দেখে যাক।

ছেলেরা ছুটল একদিকে, বালিয়া একদিকে। অন্য দিকে গৌতমবাবু।

ডাক্তার পাঁচমিনিটের মধ্যেই এলেন। লকার চোখেমুখে বালতি-বালতি জল ঢেলেও কিছু হয়নি। শিববাবু চোখের পাতা টেনেও খোলাতে পারলেন না।

পঞ্চাননবাবু বললেন,—স্ট্রেইঞ্জ! এমন ব্যাপার জীবনে দেখিনি, শুনিনি। ছেলেটা মারা গেলে আর রক্ষে থাকবে না।

ওর মধ্যেই একটু সুস্থ বোধ করছেন, এবার পণ্ডিতস্যার বললেন,—ও লকা, ওঠ বাবা! তোর সাত খুন মাপ। এমন তো কতই হয়!

তবুও লকা ওঠে না। ডাক্তার বললেন,—হাসপাতালে নিয়ে যান। লাইফ সেভিং ড্রাগ, অক্সিজেন, ইনজেকশান দিতে হবে। গলায় এমনভাবে চেপে ধরা হয়েছে যে লাং কোলাপস্ করে গেছিল। পালস্ রেট লো। আমার কিছু করার নেই।

হাসপাতালের বেডে লকা শুয়ে রইল ঘণ্টাখানেক। তার জীবন নিয়ে সংশয়। হেডস্যার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে। মা, পিসিমা সকলেই হাজির। ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে। ঈশ্বরের কাছে লকার প্রাণ ভিক্ষা করছেন।

ডাক্তারবাবু বললেন,—একটা ইনজেকশন দিতে হবে, দামি। ওটা আনতে দিয়েছি। ওটা পড়লেই আশাকরি জ্ঞান ফিরে আসবে। চিন্তা করবেন না।

হঠাৎ লকা চোখ খুলে ফেলল,—আমি কোথায়?

পণ্ডিতস্যার, হেডস্যার, ডাক্তারবাবু সকলে ছুটে এলেন। বঙ্কা পাশেই ছিল, সে চেঁচিয়ে উঠল,—চোখ খুলেছে।

পিসিমা বললেন,—জয় দুগ্গা! পুজো ষোলো আনা দেব মা!

সেবারের মতো ফাঁড়া কেটে গেল।

বঙ্কা,—লকার কানে-কানে বলল,—ব্যাপার কী রে। কী করে হল এমন?

প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল লকা,—শবাসন, বুঝলি। বালিয়া যা চেপে ধরে ছিল না, মনে হল প্রাণ বেরিয়ে গেল। তারপর কিছুক্ষণ আর জানি না। তারপর...ডাক্তারবাবু কী যেন ইনজেকশন দেবে বলছিল না—ওটা আর দেবে না তাই না?

ছবি প্রদীপ চক্রবর্তী

আরব্য রজনীর গল্প

ঘানেম কাহিনি

চিত্রনাট্য ও ছবি **অমর মজুমদার**

সম্রাটের চোখকে ফাঁকি দেওয়া খুব কঠিন। তাছাড়া তিনি জানেন আমি ফেটনাবকে সহ্য করতে পারি না।
বেগম সাহেবা, আমার বুক ধড়ফড় করছে। ধরা পড়লে কী হবে?
সম্রাটকে কবরটা দেখানো যাবে না। অন্য কিছু বলতে হবে।
কী বলবেন? এখান থেকে পালিয়ে গেছে?
না। উনি বিশ্বাস করবেন না।
আমার মাথায় কিছু আসছে না। তোরা ভেবে কিছু বল।
বেগম সাহেবা, যদি একটা নষ্ট হয়ে যাওয়া লাশ ওর কবরে রেখে দেওয়া হয়?
বুদ্ধিটা মন্দ নয়। তবে আরও ভাবতে হবে গোরস্থানে সম্রাটকে পাঠাতে চাইছি না।
ওঃ, কী যে করি! আমার নিদ হারাম হয়ে গেছে।
বেগম সাহেবা। আপনি বলেছেন বলে আমরা ওকে বিষ খাইয়েছি। আমাদের বাঁচান।
কোনও পাকা মাথার বুদ্ধি নিতে হবে। নইলে খুব বিপদ।
চলবে

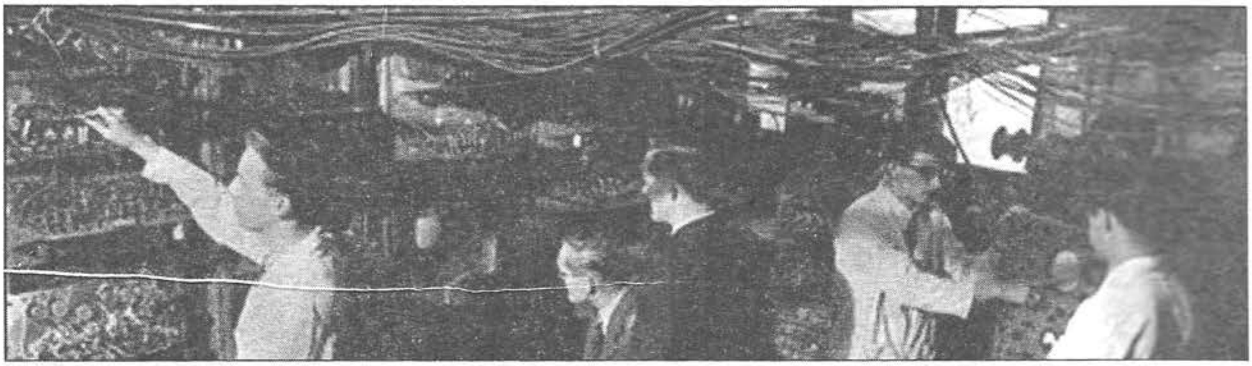

৬০ বছরের বেবি

১৯৪৮ সালের ২১ জুন। আজ থেকে ঠিক ৬০ বছর আগের কথা। ম্যানচেস্টারের এক ল্যাবরেটরির আঁতুরঘরে জন্ম নিয়েছিল বেবি। আধুনিক কমপিউটারের ভ্রূণ যাকে বলা হয়। সম্প্রতি ৬০ বছরে পা দিল বেবি। সেদিন স্বপ্নের কমপিউটারের পথ চলার সাথী হয়েছিলেন যে বিজ্ঞানীরা, তাঁদের মধ্যে মাত্র ৪ জন বেঁচে রয়েছেন। বেবির ক্ষমতা ছিল ১২৮ বাইট বা ১০২৪ বিট। এখনকার কমপিউটারের ক্ষমতা অবশ্য কয়েকশো কোটি বিট। সম্প্রতি ম্যাঞ্চেস্টারের মিউজিয়াম অফ সায়েন্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি কর্তৃপক্ষ বেবিকে সর্বসাধারণের প্রদর্শনের জন্য রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হবে ওই চারজন বিজ্ঞানীকেও। বেবির জন্মদাতা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জিওফ টুটিল সেদিনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বলেছেন, ব্রিটেনের কলোসাস এবং আমেরিকার এনিয়াক মেশিনের পর বেবিই আধুনিক কমপিউটারের প্রথম পদক্ষেপ।

কীটনাশকে মারা যাচ্ছে সিংহ

কার্বোফুরান। ইউরোপ কিংবা আমেরিকা তো বটেই, বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে এর ব্যবহার বহুদিন আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু কেনিয়াতে এই কার্বোফুরান কীটনাশক খেয়েই সম্প্রতি বেশ কিছু সিংহের মৃত্যু হয়েছে। পৃথিবীবিখ্যাত পরিবেশবিদ্ ড. রিচার্ড লিকের মতে, কৃষকরা নয়—যাঁরা সিংহ, লেপার্ড বা অন্য বন্যজন্তুদের মেরে ফেলতে চাইছে, তারাই এই কীটনাশক ব্যবহার করছে। রাজধানী নাইরোবি শহরেই সুলভে পাওয়া যায় এই কীটনাশক। যাঁদের নিজস্ব চাষের জমি নেই, তাঁরাও এই ওষুধ ছড়িয়ে দিচ্ছেন অন্যের জমিতে। শুধু সিংহ কেন, শকুন বিশেষজ্ঞ সাইমন থমসেটের মতে, কিছুদিন আগে অথি নদীতীরে যে ১৮৭টি শকুন একসঙ্গে মারা গিয়েছিল, সেটাও কার্বোফুরানের কারণেই। পশুবিজ্ঞানীদের মতে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই কীটনাশকের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি না হলে অনেক প্রাণীর সংখ্যাই কমে যাবে।

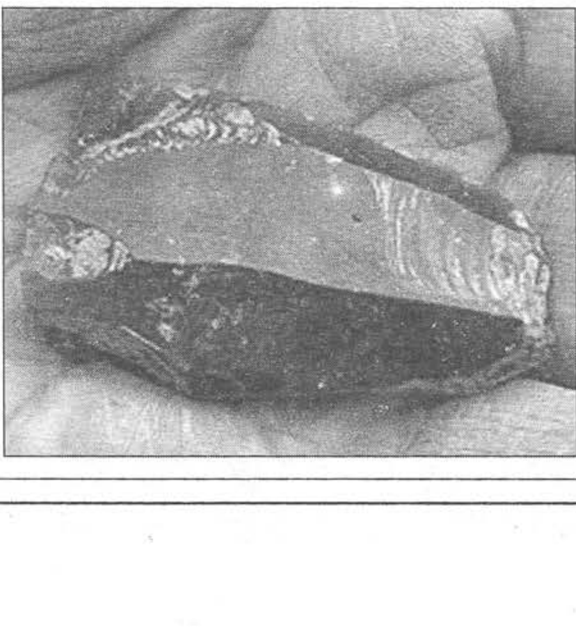

মিলল নিয়েনডারথাল যুগের অস্ত্র

নিয়েনডারথাল যুগের মানুষরা কী ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত, তার সন্ধান মিলল ওয়েস্ট সাসেক্স প্রদেশে। নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মতে, নিয়েনডারথালদের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে এটিই সবচেয়ে পুরোনো। ঘোড়া, ম্যামথ এবং গণ্ডার শিকার করতেই এই অস্ত্র ব্যবহার করা হত। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ম্যাথু পোপের মতে, ১৯০০ সালে এখানে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হলেও এই আবিষ্কার অনেকটাই ইতিহাসকে এগিয়ে দেবে, সন্দেহ নেই। আপাতত মনে হচ্ছে, নিয়েনডারথাল যুগের এর থেকে পুরোনো অস্ত্র হয়তো আর পাওয়া সম্ভব নয়। ওয়েস্ট সাসেক্স ছাড়াও উত্তর ইউরোপের অনেক প্রদেশেই নিয়েনডারথালদের বসবাস ছিল। ব্রিটেনের অপর ঐতিহাসিক রবার্ট জেকবিও সম্প্রতি উদ্ধার হওয়া এই অস্ত্রগুলিকে আদিম নিয়েনডারথালদের বলেই উল্লেখ করেছেন।

রাতুল দত্ত

হা হা হি হি

সাত খুন মাপ

বিচারক (আসামিকে) ঃ তুমি পরপর সাতটা খুন করেছ?
আসামি ঃ হ্যাঁ হুজুর, করেছি।
বিচারক ঃ জানো, এর শাস্তি কী?
আসামি ঃ জানি হুজুর। সাত খুন মাপ।

ওখানেই থেকো

রাস্তায় যেতে-যেতে এক মহিলা কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল। তার স্বামীও সঙ্গে ছিল। স্বামীটি ওপর থেকে স্ত্রীকে বলল, আমি এখনই একটা বাঁশ আর দড়ি নিয়ে আসছি। যতক্ষণ না ফিরে আসি তুমি ওখানেই থেকো, অন্য কোথাও যেও না।

দাঁতের আমি, দাঁতের তুমি

এক বৃদ্ধ স্কচ দম্পতি রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়েছেন। ওয়েটার তাঁদেরকে কী খাবেন জিজ্ঞাসা করাতে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন ঃ দুটো ফিশ কাটলেট। ফিশ কাটলেট এল। ওঁরা একটা কেবিনে বসে খাওয়াও শুরু করলেন। কিন্তু বহুক্ষণ হয়ে গেল ওঁদের খাওয়া আর শেষ হয় না। শেষপর্যন্ত কেবিনে ঢুকে দেখল, ভদ্রলোক তখনও কাটলেট খাচ্ছেন, আর তাঁর স্ত্রী সামনে আস্ত কাটলেট রেখে চুপ করে বসে আছেন।

ওয়েটার অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল ঃ কী হল, ম্যাডাম, আপনি খাবেন না।

ভদ্রলোক তখন একটু হেসে উত্তর দিলেন ঃ দ্যাখো, আমাদের দুজনেরই একপাটিও দাঁত নেই। তাই আমরা বাঁধানো দাঁতে খাচ্ছি। কিন্তু শুধু-শুধু কেন দুজনেই দাঁত বাঁধিয়ে এত পয়সা খরচ করব? তাই একসেট দাঁতই বাঁধিয়েছি। আমার খাওয়া শেষ হলে দাঁতের পাটি দুটো খুলে ওঁকে দেব, তখন উনি কাটলেটটা খাবেন। এইভাবেই আমরা খাওয়াদাওয়া সারি।

সবসময়েই মাথা উঁচু থাকে!

দুই বন্ধুতে বসে আড্ডা মারছিল।

প্রথম বন্ধুটি বলে উঠল ঃ জানিস অমর, আমি কখনও বউয়ের কাছে নীচু হই না। যখন ওর সঙ্গে কথা বলি, সবসময়েই আমার মাথা উঁচু থাকে।

দ্বিতীয় বন্ধুটি বলল ঃ বলিস কী! তোর তো খুব সাহস! কী করে বউয়ের সামনে সবসময় মাথা উঁচু রাখিস।

প্রথম বন্ধুটি উত্তর দিল ঃ আরে, আমি যে বউয়ের চেয়ে অনেক বেঁটে! তাই মাথা উঁচু করে মুখ তুলেই ওর সঙ্গে কথা বলতে হয়।

তাই এত ঠান্ডা

খদ্দের (ওয়েটারকে) ঃ কী হে, এ কীরকম চা দিয়েছ?

ওয়েটার ঃ কেন স্যার, চা-টা কি খারাপ? একেবারে খাঁটি দার্জিলিং-এর চা।

খদ্দের ঃ এবার বুঝেছি। তাই এত কনকনে ঠান্ডা।

বাঘে ঘাস খাচ্ছে

এক শিক্ষক কয়েকজন ছাত্রকে ছবি আঁকতে দিয়েছে। একটি ছেলে আঁকল, একটা বাঘ ঘাস খাচ্ছে! শিক্ষক তো অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এটা কী এঁকেছ তুমি? বাঘে ঘাস খাচ্ছে? বাঘে কি ঘাস খায়?

ছাত্র চটপট উত্তর দিল ঃ হ্যাঁ স্যার, খায়। আজকাল খাচ্ছে। মাংসের দাম আজকাল যা বেড়ে গিয়েছে, তাতে ঘাস খাওয়া ছাড়া বাঘের আর উপায় কী?

ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী

কুই

সওয়াল

১॥ ক্যালসিয়াম ক্লোরো হাইপোক্লোরাইড কী?
২॥ মানস সরোবর হ্রদ কোথায় অবস্থিত?
৩॥ আমাদের দেহের সবচাইতে শক্তিশালী হাড় কোনটি?
৪॥ কোন মার্কিন শহরকে কোকাকোলার শহর বলা হয়?
৫॥ জাতীয় স্টক এক্সচেঞ্জ (NSE) কবে চালু হয়?
৬॥ পারদ ছাড়া অন্য তরল ধাতুটির নাম কী?
৭॥ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অসুবিধা থাকলে কে তা নিষ্পত্তি করেন?
৮॥ পুলিৎজার পুরস্কারটি কোন ক্ষেত্রে প্রদান করা হয়?

জানা-অজানা

নির্ভয়ে ট্রেকিং

পাহাড়ি অঞ্চলে ভ্রমণ বা ট্রেকিং ভারতে ক্রমবর্ধমান একটি 'হবি' হিসাবে মানুষ গ্রহণ করেছেন। আমাদের দেশ গরমের দেশ। ওই ঠান্ডা আবহাওয়ায় মানিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন কয়েকটি সতর্কতামূলক পদক্ষেপ। এগুলি হল—

১॥ উচ্চতায় ওঠা খুব ধীরে শুরু করতে হবে এবং একটু-একটু করে নিজেকে অর্থাৎ নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসকে পরিবর্তিত আবহাওয়ায় মানিয়ে নেওয়ার মতো সময় দিতে হবে।

২॥ পাহাড়ে ট্রেকিং-এর সময় একটু চলার পরই পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে এবং কখনওই বেশি পরিশ্রম করা ঠিক হবে না।

৩॥ ডিহাইড্রেশন (Dehydration) এড়াতে অনবরত মৃদু গরম জল পান করতে হবে।

৪॥ সামান্যতম অসুস্থ বোধ করলেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৫॥ শুকনো খাবারের মধ্যে পুষ্টিদায়ক খাবার থাকা জরুরি যাতে প্রচুর পরিমাণে শর্করা এবং কার্বোহাইড্রেট আছে। খাবার কম পরিমাণে খাওয়া উচিত। ধূমপান বা মদ্যপান না করাটাই বাঞ্ছনীয়।

৬॥ হাওয়া ঢুকতে না পারে এমন পোশাক দরকার। শুকনো এবং যথার্থভাবে শীত আটকানো পোশাক প্রয়োজন যার মধ্যে বেশ কয়েকটা স্তর আছে। কারণ, এই ধরনের পোশাকে হঠাৎ করে বৃষ্টিজনিত আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রার দ্রুত পরিবর্তন আটকানো সম্ভব।

৭॥ ঠান্ডার কামড় থেকে বাঁচতে শরীরের কোনও অংশ খোলা রাখা যাবে না। খালি হাতে কোনও ধাতু না ধরা উচিত।

৮॥ একটু উন্নত ধরনের বরফ চশমা ব্যবহার করতে হবে চোখের সুরক্ষার স্বার্থে।

৯॥ গ্রুপে ট্রেকিং করাই শ্রেয় যাতে বিপদের সময় পাশে বন্ধুরা থাকে।

জবাব

১॥ ব্লিচিং পাউডার
২॥ তিব্বত
৩॥ নিম্ন চোয়ালের (Lower Jaw)
৪॥ আটলান্টা
৫॥ ১৯৯৪ সালে
৬॥ গ্যালিয়াম
৭॥ মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট
৮॥ সাংবাদিকতা

জানো কি ?

WORLD BANK, WORLD DEVELOPMENT INDICATOR, 2005

বিভিন্ন দেশের মানুষের গড় আয়ু, শিশু মৃত্যু, পাঁচ বছরের নীচে শিশুর মৃত্যু, ৬৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকার হার

ক্রমিক নং	দেশের নাম	গড় আয়ু ২০০৩	এক বছরের নীচে শিশুমৃত্যু প্রতি ১০০০ শিশুর মধ্যে	পাঁচ বছরের নীচে প্রতি হাজারে যত শিশু মারা যায়	৬৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকার শতাংশ পুরুষ	মহিলা
24.	লিবিয়া	73	13	16	73	83
25.	মালয়েশিয়া	73	7	7	72	83
26.	মরিশাস	72	16	18	71	85
27.	মেক্সিকো	74	23	28	75	86
28.	মায়ানমার	57	76	107	47	58
29.	নামিবিয়া	40	48	65	21	25
30.	নেপাল	60	61	82	58	57
31.	নেদারল্যান্ড	78	5	6	84	90
32.	নাইজেরিয়া	45	98	198	32	36
33.	নরওয়ে	79	3	5	84	91
34.	পাকিস্তান	64	74	98	65	71
35.	পোল্যান্ড	75	6	7	72	87
36.	সিঙ্গাপুর	78	3	5	83	90
37.	সুইডেন	80	3	4	86	92
38.	সুইজারল্যান্ড	80	4	6	85	93
39.	থাইল্যান্ড	69	23	26	67	78
40.	ইউ. এস. এ.	77	7	8	82	90
41.	ইউ. কে.	78	5	7	80	86
42.	ভিয়েতনাম	70	19	23	75	86
43.	জাম্বিয়া	36	102	182	16	21

অনিন্দ্য সেনগুপ্ত

সৌম্যনারায়ণ আচার্য

ভদ্রা নদীর তীরে

এখন মে মাস, অথচ বিকেল শুরু হতেই ঠান্ডা হাওয়া শিরশির করে গাড়ির কাচের ফাঁক দিয়ে ঢুকতে লাগল। আমরা সঙ্গে কেউ শীতবস্ত্র আনিনি, যদিও জানতাম চিকমাগালুর হল পাহাড়ি জেলা। আর দক্ষিণে পাহাড় বলতে নীলগিরি বা উটি ছাড়া অন্য কোনও কথা মনে পড়ে না। কর্ণাটকের এই অঞ্চলে যে এমন সুন্দর একটা জায়গা আছে তা আমরা আগে জানতাম না।

পেছনের সিটে বীরুদা প্রায় কাঁপছিলেন। ড্রাইভার নাগাপ্পা ওঁর দিকের কাচ একটু তুলে দিল। কালও অবশ্য ওঁর একই অবস্থা দেখেছি। আমি নাগাপ্পার পাশেই বসে আছি, আমার ঠিক পেছনে বীথি আর ওর মামাতো ভাই বিনু, আর উলটোদিকে বীরুদা আর স্বর্ণালী বউদি।

আসলে কয়েকদিন আগে আমরা বাঙ্গালোরে বীথিদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলাম। বীথির বাবা অর্থাৎ ঘোষকাকু ওখানে একটা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ম্যানেজার আর আমাদের পারিবারিক বন্ধু। উনি আর কাকিমা অনেকবার আমাদের কর্ণাটকে বেড়াতে আসতে বলেছেন। তাই এবার গরমের ছুটির সময়ে আসতেই হল। আর তখনই বীথি আমাদের এই পাহাড়, চা আর কফি বাগানে ঘেরা শহরটির কথা বলল।

চা বাগান তো আমরা সবাই দেখেছি, কিন্তু কফি বাগান? ওটাতো দেখতেই হবে আর কলকাতাতে ফিরে গিয়ে বন্ধুদের সবাইকে চমকে দিতে হবে।

কলকাতা থেকে আমার সঙ্গে বিনুও এসেছে। স্বর্ণালী বউদি হলেন ঘোষকাকিমার বোনঝি।

প্রথমে চারদিন আমরা বাঙ্গালোর শহর আর ওর আশেপাশের কয়েকটা জায়গা দেখলাম। তারপরে একদিন বিকেলে ডিলাক্স বাসে চড়ে চিকমাগালুর শহরে পৌঁছে প্ল্যান্টার্স কোর্ট হোটেলে উঠে পরদিন সকালে আমরা কর্ণাটকের সর্বোচ্চ মুলায়ানাগিরি পাহাড়ের ছ'হাজার চারশো ফুট উঁচু চুঁড়োয় চড়লাম, আর ওখানে কফিবাগানে ঘোরাঘুরি করলাম। লাল-লাল কফি শুটি হাতে নিয়ে ওর থেকে সবুজ বীজ বের করলাম। তারপরে উজ্জিরে ক্রস হয়ে কুদ্রেমুখের একেবারে চুঁড়োয় পৌঁছে মোহিত হয়ে গেলাম। দূর থেকে এর চুঁড়ো ঘোড়ার মুখের মতো দেখায়, তাই এর নাম কুদ্রেমুখ। স্থানীয় ভাষায় কুদ্রে মানে ঘোড়া। পাহাড় যে এত সুন্দর হতে পারে তা এখানে না এলে বোঝা যাবে না।

তখনই নাগাপ্পা বলেছিল কাল যদি আমরা হোরানাডু যাই, তাহলে কুদ্রেমুখের অন্যদিকটাও দেখতে পাব। তাই আমরা আজ ভোরে বেরিয়ে প্রথমে হোরানাড়ুতে অন্নপূর্ণেশ্বরীর মন্দিরে দর্শন সেরে কুদ্রেমুখ ন্যাশনাল পার্কে বাঘ, লেপার্ড, গৌর বা ভারতীয় বুনো মোষ, নানা জাতীয় হরিণ আর পাহাড়ের অন্য দিকে ভিয়ার পার্ক আর বাগান দেখে চিকমাগালুরে ফিরছি। আসবার সময় শান্ত ভদ্রা নদীর তীরে কিছুক্ষণ কাটিয়েছি।

আসতে-আসতে নাগাপ্পা আমাদের কফি বাগানের ভুতের কথা বলল। শুনে বীরুদা প্রশ্ন করেন,—এখানেও ভূত আছে?

—হ্যাঁ স্যার। যেসব ড্রাইভার এই পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তায় পথ হারিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে মারা যায়, তাদের নাকি রাত্রে দেখা যায়। আমিও একবার দেখেছিলাম।

আমরা তখন দূরের পাহাড়ে সূর্যাস্তের দৃশ্য উপভোগ করতে-করতে চলেছি, ওর কথা শুনে প্রশ্ন করি,—তুমি কীরকম ভূত দেখেছ?

পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তায় আস্তে-আস্তে গাড়ি চালাতে-চালাতে নাগাপ্পা বলল,—একবার আমি হোরানাড়ু থেকে ভোরে এক নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছিলাম, আর তখনই এইরকম ফাঁকা রাস্তায় গাড়িটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। রাস্তা একদম অন্ধকার, ঘড়িতে তখন ভোর চারটে। আমি কী করব ভাবছি, এমন সময় বাঁ-দিকের কফি বাগান থেকে কম্বল মুড়ি দেওয়া একজন লোক এসে লিফট চাইল।

আমি ওকে বললাম যে, গাড়িটা তো খারাপ হয়ে গেছে। লোকটি কিন্তু গাড়ির বনেট খুলে অন্ধকারেই কী সব নাড়াচাড়া করে ভেতরে উঠে বলল,—নাও, স্টার্ট করো। আর অবিশ্বাস্য ব্যাপার, গাড়ি চালু হয়ে গেল। আমি গাড়ি চালাচ্ছি, কিন্তু লোকটার মুখ একদম দেখতে পাচ্ছি না। তাই আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল।

বীরুদা প্রশ্ন করেন,—তখন আপনি কোন জায়গায় ছিলেন।

—কলস পেরিয়ে প্রায় তিন কিলোমিটার যাওয়ার পরই ঘটনাটা ঘটে, তখন প্রায় সন্ধে সাতটা। অর্থাৎ চিকমাগালুর থেকে প্রায় আশী কিলোমিটার দূরে। আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম আর পেছনে তাকিয়ে দেখছিলাম। কিন্তু আলডুর কাছে আসতে যখন রাস্তার আলো ভেতরে ঢুকল, তখন আমি যা দেখলাম তাতে প্রায় অজ্ঞান।

আমি জিজ্ঞাসা করি, কেন?

—গাড়ি এক্কেবারে ফাঁকা, পেছনের সিটে কেউ নেই। আমি যেই গাড়ি থামিয়ে দরজা খুলে দেখতে যাচ্ছি, অমনি দেখি ও সিটে বসে আছে। আমাকে বলে, চালাও আর দেরি করো না। আমি আর কী করি, কোনও প্রশ্ন না করে গাড়ি চালাতে শুরু করলাম। চালাতে-চালাতে বুঝতে পারছিলাম যে, আমি অচেনা রাস্তা দিয়ে চলেছি। পেছনে তাকিয়ে দেখি কম্বলে ঢাকা মূর্তি আবার অদৃশ্য।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরেই গাড়ি চিকমাগালুরে ঢুকল। এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার, কারণ আলডুর থেকে এর দূরত্ব হল ষাট কিলোমিটার। যা পাঁচ মিনিটে পৌঁছান অসম্ভব।

বাড়ির সামনে গাড়ি থামাতে বাবা দরজা খুলে বললেন, কে একজন কম্বল মুড়ি দেওয়া লোক গাড়ির পেছনের দরজা খুলে নেমে চলে গেল।

এই ধরনের অভিজ্ঞতা আরও অনেকের হয়েছে। একজন ভদ্রা নদীর তীরে ভূত দেখেছিল।

কর্ণাটকে ভাষার কোনও সমস্যা নেই, অধিকাংশ লোকই হিন্দি বলতে বা বুঝতে পারে। নাগাপ্পা খুব ভালো হিন্দি আর ইংরেজি বলতে পারে। বীথি আর বিনু দুজনেরই ভূতে খুব ভয়। ওরা উশখুশ করছিল। বীথি আর থাকতে না পেরে বলে ফেলল,—থাক আর ভূতের গল্প বলতে হবে না।

বীরুদা বললেন,—কেন, বলুক না। ভয় লাগলে একদম বিশ্বাস করবি না। বিশ্বাস করলেই ভয় পাবি। নাগাপ্পা ক্যারি অন।

নাগাপ্পা বলল,—কয়েক বছর আগে, এক যাত্রী বোঝাই বাস এই রাস্তার কাছেই নদীতে পড়ে গেছিল। প্রায় কুড়িজন যাত্রী ওই ঘটনায় নিহত হয়েছিলেন। তারপর থেকেই রাত্রে কেউ-কেউ নদী থেকে কিছু মানুষকে উঠে আসতে দেখেছে।

আরও একটা ভূতের গল্পের গন্ধ পেয়ে আমি বলি,—তাই নাকি? একটু খুলে বলবে?

নাগাপ্পা বলল,—আমার এক দূর সম্পর্কের কাকা কুদ্রেমুখ থেকে একটু বেশি রাত করেই ফিরছিল। নদীতীরে ও সিগারেট খাওয়ার জন্যে গাড়ি থামাল। যখন সিগারেটটা ধরিয়ে একটা টান দিয়েছে, অমনি দেখল নদী থেকে কতগুলো মানুষ উঠে আসছে। অন্ধকারে লোকগুলো কালো-কালো দেখাচ্ছিল আর ছায়ামূর্তির মতো ওরা এগিয়ে আসছিল।

ব্যাপারটা কী বুঝতে-বুঝতেই খানিকটা সময় কেটে গেল। এক সময় আমার কাকা দেখলেন যে, প্রায় দশজন মেয়ে আর ছেলে দুদিক থেকে ওঁর গাড়িটা ঘিরে ফেলেছে। কাকা তখন সিগারেট ছুড়ে ফেলে দিয়ে গাড়িটা চালাতে শুরু করলেন। অমনি যেন গাড়ির ধাক্কায় কয়েকটা লোক পড়ে গেল, আর আর্তনাদ করে উঠল। কাকা যখন ব্রিজের ওপর দিয়ে চালাচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ নদীর জল বাড়তে লাগল। দেখতে-দেখতে ব্রিজ ছুঁয়ে ফেলল নদীর জল। কাকা আর কোনও উপায় না দেখে ব্রিজের ওপর দিয়ে জোরে গাড়িটা ছোটালেন।

হঠাৎ তিনি দেখলেন, চিকমাগালুর নয়, তাঁর গাড়ি কুদ্রেমুখের রাস্তা দিয়েই চলেছে। অর্থাৎ গাড়ি যেন এক যাদুমন্ত্রে উলটোমুখে চলেছে। তিনি গাড়ি চালাচ্ছেন আর পেছনে লোকগুলোর বা ভূতগুলোর চিৎকার শুনতে পাচ্ছেন।

এমন সময় তাঁর মনে হল পাহাড়ের একটা চুড়ো যেন রাস্তা অবরোধ করে দাঁড়াল, আর তাঁর গাড়ি সোজা পাহাড়ের এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে উঠতে-উঠতে একটা বড় গাছে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল। তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

যখন তাঁর জ্ঞান ফিরল, তিনি দেখলেন যে, বাড়ির সদর দরজার সামনে পড়ে আছেন আর গাড়িটা দুমড়ে-মুচড়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তখন সবে সকাল হয়েছে, তাঁর এই অবস্থা দেখে তো পাড়া প্রতিবেশী আর বাড়ির সবাই বিস্মিত। কাকা এর কোনও উত্তর দিতে পারলেন না, গাড়িটার ওই রকম অবস্থা হল কী করে সেটাও বোঝা গেল না।

নাগাপ্পার গল্প শুনতে-শুনতে আমাদের গাড়ি ভদ্রা নদীর তীরে এসে গেল। আমরা তখন ওকে গাড়ি থামাতে বললাম, কারণ খুব খিদে পেয়ে গেছে। ভেতরের আলো জ্বালিয়ে প্যাকেট থেকে কেক, বিস্কুট আর মিস্টি বের করে খাওয়া শুরু করলাম। আমাদের গাড়ি বাঁ-দিকের নির্জন রাস্তায় পার্ক করা হয়েছে। আমরা যখন খাচ্ছি, তখন বীরুদা বললেন,—কী দারুণ পরিবেশে আমরা খাচ্ছি তাই না?

বউদি বললেন,—কেন, সেবারে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং-এর রাস্তায় যখন আমরা গাড়ির ভেতরে জলখাবার খাচ্ছিলাম, তখনও এই রকম লাগছিল।

খাওয়াদাওয়া সেরে নাগাপ্পা যেই গাড়িতে স্টার্ট দিল অমনি একটা শব্দ করে ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি থেমে গেল। নাগাপ্পা অনেক চেষ্টা করেও গাড়িটা আর স্টার্ট করতে পারল না। শেষে বাইরে বেরিয়ে বনেট খুলেও যখন কিছু করতে পারল না, তখন জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল,—আপনারা ভেতরে বসে থাকুন। আমি পাশের গ্রাম থেকে মেকানিক নিয়ে আসছি।

বলে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ও চলে যাওয়ার পরে প্রথম কথা বললেন স্বর্ণালী বউদি, তিনি বীরুদাকে বললেন,—লোকটা চলে গেল, আর তুমি ওকে যেতে দিলে?

বীরুদা বললেন,—কী করব বল? ও বলল পাশের গ্রামে মেকানিক পাওয়া যাবে, তাই কিছু বললাম না।

বউদি বললেন,—ব্যাপারটা আমার কিন্তু ভালো ঠেকছে না। আসার সময় দেখেছি অন্তত মাইল তিনেক দূরে একটা গ্রাম আছে। ও এই অন্ধকারে কিছুতেই সেখানে পৌঁছতে পারবে না।

বীথিও বউদির কথায় সায় দিল। আমি তখন কিছু বলতে যাব, এমন সময় একটা জিপ উলটো দিক থেকে এসে ঠিক আমাদের পাশে ব্রেক কষে দাঁড়াল। ব্যাপারটা কী বোঝার আগেই গাড়িটা থেকে দুজন লোক নেমে আমাদের কাছে এসে জানলায় মুখ বাড়িয়ে জিগ্যেস করল,—আপনারা?

আমাদের মধ্যে বীরুদা হলেন বয়েসে সবচেয়ে বড়, তাই তিনিই উত্তরে সবকিছু বললেন। আমরা তখন দেখলাম যে, দুজনের একজন পুলিশ অফিসার আর অন্যজন বোধহয় সেপাই। সেই অফিসার বলল,—যতক্ষণ না আপনাদের ড্রাইভার আসে, আপনারা কেউই গাড়ি থেকে নামবেন না।

বলে উনি সিপাই সমেত জিপে উঠলেন আর গাড়িটা আওয়াজ করে কুদ্রেমুখের দিকে চলে গেল। আমরা বসে আছি, আর সামনের দিকে তাকিয়ে আছি। রাস্তাটা চিকমাগালুরের দিকে গেছে। এই রাস্তার বাঁ-দিকে গাছে ঘেরা ভদ্রা নদী বয়ে চলেছে। আর দুদিন পরে সম্ভবত পূর্ণিমা, তাই আকাশে চাঁদের ফিকে আলোয় জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে নদীর জল চিকচিক করছে দেখতে পাচ্ছি! সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, এখানে একটুও মশার উপদ্রব নেই। বোধহয় পাঁচ হাজার ফুট উঁচু বলেই এই জায়গায় মশারা থাকতে পারে না।

হঠাৎ বিনু বলল,—কীসের একটা গন্ধ পাচ্ছি তাই না?

আমি বললাম,—ওটা কফি ফুলের গন্ধ। সকালে দেখেছিস মনে নেই?

বীথি নিজের মোবাইলটা বের করে বাঙ্গালোরের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল,—এদিকে বোধহয় নেটওয়ার্ক নেই।

বিনু জিগ্যেস করল,—আচ্ছা পুলিশ অফিসার আমাদের বাইরে বেরুতে বারণ করল কেন?

আমি বললাম,—নাগাপ্পা বলছিল, গত বছর কুদ্রেমুখ ন্যাশনাল পার্ক থেকে দুটো বাঘ বেরিয়ে এদিকের গ্রামগুলোতে ঢুকে পড়েছিল। কয়েকজন গ্রামবাসীকে আহত করেছিল, গরুছাগলও খেয়েছিল। লেপার্ড আর প্যান্থারগুলোও মাঝে-মাঝে এদিকে চলে আসে, তাই বোধহয়।

বীথি বলল,—হাতিরাও মাঝেমধ্যে এদিকে চলে আসে আর কফিগাছগুলো নষ্ট করে।

বীরুদা বললেন,—বাঘ বা লেপার্ড এলে অবশ্য গাড়ির ভেতরে আমরা নিরাপদে থাকব, কিন্তু হাতির পাল যদি আসে তাহলে কোনও রক্ষা নেই, ওরা আমাদের এই গাড়িটা নিয়ে ফুটবল খেলবে।

স্বর্ণালী বউদি বাধা দিয়ে বলেন,—ও সব অলক্ষুণে কথা বলতে নেই।

বীরুদা বললেন,—একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিস? এতক্ষণ বসে আছি অথচ একটাও গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে না। জায়গাটা কেমন যেন অস্বাভাবিক রকমের নিস্তব্ধ।

নাগাপ্পা প্রায় চল্লিশ মিনিট আগে গেছে। ও না এলে আমরা কী করব ভাবছি, এমন সময় একটা ছায়া মূর্তি ঠিক বাঁ-দিকের কফি বাগান থেকে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। ওকে দেখে বীরুদা বললেন,—শুনেছি কফি বাগানে রেস্ট হাউস থাকে, যদি এই লোকটা আমাদের ওখানে রাতটা কাটাবার কোনও ব্যবস্থা করে দেয় তা হলে খুব ভালো হয়।

লোকটা একটু দাঁড়িয়ে থেকে রাস্তা পেরিয়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে এল, তারপরে হঠাৎ বনেট খুলে কী যেন দেখতে লাগল। বউদি আস্তে-আস্তে বীরুদাকে বললেন,—এই লোকটা কিছুতেই নাগাপ্পা নয়।

বীরুদা চেঁচিয়ে বললেন,—কে ওখানে?

লোকটা জবাব দিল,—আমি নাগাপ্পা স্যার, গাড়ি ঠিক হয়ে গেছে।

বলেই কিছু না বলে দরজা খুলে সিটে এসে বসল। আর স্টার্ট দেওয়ামাত্র গাড়ি ছুটতে শুরু করল। যেই গাড়ি চলতে শুরু করল, অমনি বীথি বলে উঠল,—যাক, আমাদের কালকের ট্যুরটা তাহলে হচ্ছে।

কালকে আমাদের কেম্মানাগুন্ডি শৈলাবাস, তিনটে জলপ্রপাত, ভদ্রা অভয়ারন্য আর বেলাওয়াডির মন্দির দেখতে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে। নাগাপ্পা অবশ্য এই কথার কোনও উত্তর দিল না। আমরা ওর এই চুপচাপ থাকাটা যেন মেনে নিতে পারছি না, কারন নাগাপ্পা মানুষটা খুবই আলাপি আর রসিয়ে-রসিয়ে গল্প বলতে ভালোবাসে। আমাদের এই টয়োটা ইনোভা গাড়িতে আটজন লোক বসতে পারে। এখন নাগাপ্পার পাশে কেউ বসেনি। ওর ঠিক পেছনেই আমি, বীরুদা আর বউদি বসে আছি। পেছনের শেষ আসনে বীথি আর বিনু মুখোমুখি বসে আছে। নাগাপ্পার নীরবতার জন্য আমরাও কোনও কথা বলছি না। আমরা ক্রমশই চিকমাগালুরের দিকে এগিয়ে চলেছি, এটা বুঝতে পারছিলাম।

যখন আমাদের গাড়ি শহরে ঢুকল, তখন আমাদের আনন্দ দেখে কে। নাগাপ্পা আমাদের ঠিক হোটেলের সামনে নামিয়ে দিল। বীরুদা যখন ওকে পয়সা দেওয়ার জন্য পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করছেন, তখন আমাদের অবাক করে দিয়ে গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে চলে গেল। আমরা ওর এই ব্যবহারে এত বিস্মিত হলাম যে, কিছুক্ষণ কোনও কথাই বলতে পারলাম না। আমরা তখনও হোটেলের লবির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। নীরবতা ভেঙে বীরুদা বললেন,—এটা কী হল?

বউদি বললেন,—লোকটা কি মদ খেয়ে এল নাকি?

বীথি আর বিনু বলে উঠল,—ওকে কাল ক'টার সময় আসতে হবে তাই বলা হল না।

বীরুদা বললেন,—চল, আগে ফ্রেশ হয়ে খাবার খেয়ে নিই, তার পরে ওকে ফোন করা যাবে।

আমরা হোটেলের দোতালায় নির্দিষ্ট রুম দুটিতে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে বীরুদার রুমে চলে এলাম। পাশাপাশি দুটো রুমের একটাতে আমি আর বিনু আর অন্যটাতে বীরুদা, বউদি আর বীথি আছেন। ওঁদের রুমেই খাবারের অর্ডার দেওয়া আছে। যাইহোক, গরম-গরম খাবার আর কফি খেয়ে আমরা সত্যিই তরতাজা অনুভব করলাম। বীরুদা বললেন,—এইবার নাগাপ্পাকে ফোন করি।

বলে উনি বেশ কয়েক বার ওঁর

মোবাইল নম্বরে কল করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু প্রতিবারই পেলেন না। বীরুদা বললেন,—যতবারই ফোন করছি, বলছে, দিস নম্বর ইজ নন রিচেবল, অর্থাৎ নাগাপ্পা যেখানে আছে, সেখানে নেটওয়ার্ক নেই।

বউদি বললেন,—অবিশ্বাস্য, এটা কী করে সম্ভব?

আমি বললাম,—হয়তো ও আমাদের নামিয়ে পাশের কোনও গ্রামে চলে গেছে।

—তাহলে আমাদের বেড়ানোর কী হবে? বিনু বলল।

—হোটেল থেকে অন্য গাড়ি নিয়ে নেব। বীরুদা বললেন।

আমরা সবাই খুব ক্লান্ত বোধ করছিলাম, তাই তাড়াতাড়ি শুতে গেলাম। আর কম্বল মুড়ি দিয়ে শোওয়ার পরই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম। সকাল ছ'টার সময় দরজা ধাক্কার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। আমি দরজা খুলে দেখি বাইরে বীরুদা আর নাগাপ্পা দাঁড়িয়ে আছে। তখন বিনুও উঠে বসেছে। বীরুদা বললেন,—একবার আমাদের রুমে আয়।

আমি আর বিনু দরজা বন্ধ করে ওঁদের রুমে চলে গেলাম। ওখানে গিয়ে দেখি বীরুদা খুব চিন্তিত মুখ নিয়ে বসে আছেন। আর ওঁর পাশে বউদি আর বীথি বসে আছে। নাগাপ্পা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা যেতেই ও বসে পড়ল। আমরা বীরুদার দিকে চাইতেই উনি বললেন,—নাগাপ্পা কী বলছে তা শুনলে অবাক হয়ে যাবি।

আমি প্রশ্ন করি,—কী হয়েছে নাগাপ্পা?

নাগাপ্পা তখন তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে মনে হল। সে একবার আমাদের সকলের দিকে তাকিয়ে বলল,—কাল রাতে আমি যখন পাশের গ্রাম থেকে মেকানিক নিয়ে ফিরি, তখন ঘড়িতে রাত আটটা। একটু বেশিই দেরি হয়ে গিয়েছিল। আসলে রাতে কেউই আসতে রাজি হচ্ছিল না। বেশি পয়সার লোভ দেখিয়ে রাজি করালাম। তো এসে দেখি আপনারা কেউ নেই। আমি তো ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম, এমনিতে চিকমাগালুর খুব নিরাপদ জায়গা। তবুও সাবধানের মার নেই, আর আপনারা যদি নিজেরা গাড়ি চালাতে শুরু করেন, তাহলেও খুব চিন্তার ব্যাপার। কারণ, এই পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তায় অভ্যাস না থাকলে গাড়ি চালানো খুব সহজ নয়। যাইহোক, আপনাদের না পেয়ে আমি মেকানিকটাকে কিছু পয়সা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। আর প্রায় দু-ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর অনেক কষ্টে একটা কফি বোঝাই ট্রাককে আমাকে লিফট দিতে রাজি করালাম। এই ভাবেই রাত প্রায় বারোটার সময়ে হোটেলে ফিরলাম। আর সেখানেও চমক। গেটের ভেতরে আমার গাড়িটা সুন্দরভাবে পার্ক করা আছে। গাড়িটা কী করে এখানে এল? সকালে গাড়িটা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি, ওটার মধ্যে তেলই নেই, আর থাকবে কী করে, ট্যাঙ্কটা তো একেবারে ফুটো। সেই জন্যই গাড়িটা স্টার্ট হচ্ছিল না।

বীরুদা ততক্ষণে রিশেপশানে ফোন করে ছয়কাপ কফির অর্ডার দিয়েছেন। তিনি বললেন,—তাহলে কাল আমাদের কে ড্রাইভ করে নিয়ে এল?

আমরা সবাই পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম, কারণ এর উত্তর আমাদের জানা নেই। তবে যেই আমাদের নিয়ে আসুক না কেন, সে ভালো লোক ছিল, তাই না?

ছবি সুদীপ্ত মণ্ডল

সব সাধারণ সংখ্যাই অ-সাধারণ!

কিশোর ভারতী

একাধিক বিশেষ সংখ্যা এবং সুবিশাল শারদীয় সংখ্যাসহ কিশোর ভারতী-র বছরে মোট ১২টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সব মিলিয়ে প্রায় ২০০.০০।

গ্রাহক হলে শারদীয়া ফ্রি!

১ বছরে মাত্র ১৪৫.০০ (হাতে*) ১৬০.০০ (ডাকযোগে•)

৩ বছরে মাত্র ৩৮০.০০ (হাতে*) ৪১০.০০ (ডাকযোগে•)

* আমাদের ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯ (মহাত্মা গান্ধী রোড ও কলেজ স্ট্রিট মোড়ের খুব কাছেই) কাউন্টার থেকে।

• শারদীয়া কিশোর ভারতী পাঠানো হয় **রেজিস্টার্ড পোস্টে,** সাধারণ সংখ্যা **বুকপোস্টে**। যে মাসে গ্রাহকমূল্য আমাদের দপ্তরে এসে পৌঁছবে, তার পরের মাস থেকে পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।

■ বিদেশে ডাক মাশুল (বারো মাসের) : **বাংলাদেশ ৬৫০.০০ ও অন্যত্র ৯৫০.০০।**

গ্রাহক হওয়ার ফর্ম

আমি কিশোর ভারতী-র ☐ ১ বছরের
☐ ৩ বছরের গ্রাহক হতে চাই।

মানি অর্ডার/ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট নম্বর ____________

তারিখ ____________ ব্যাঙ্ক ____________

____________ শাখা ____________

টাকা ____________ পাঠালাম।

স্বাক্ষর ____________ তারিখ ____________

Name : ____________

Address ____________

____

Phone ____________

*** এই ফর্মটির জেরক্স কপি গ্রাহ্য হবে।**

বি. দ্র. ড্রাফ্‌ট, চেক বা মানি অর্ডার লেখা হবে **PATRA BHARATI**-র নামে।

পত্র ভারতী

৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

ফোন ২২৪১ ১১৭৫/২৩৫০ ১৯৪৪

e-mail patrabharati@gmail.com
kishorebharatipatrika@gmail.com

বগলা অ্যান্ড কোং

জুরান নাথ

আসল জায়গায় সাহস যে দেখাতে পারে সেই হচ্ছে সাহসী। তেমন সুযোগ এলে দেখাব সাহস কাকে বলে।
!!!
আমার জীবনের মূল মন্ত্র হচ্ছে, মারি তো গণ্ডার লুঠি তো ভাণ্ডার।
দেখা যাবে বগলাদা।
দ্যাখ্-দ্যাখ্! ওখানে অত জটলা কিসের রে পটলা?
তাই তো! চল দেখি।
সর্বনাশ! একটা বাচ্চা কুয়োয় পড়ে গেছে বগলাদা।
ওকে এখনি না তুললে মরে যাবে বেচারা!
চলবে

জ্যাক রিচি

ভোরের অতিথি

অনুবাদ দেবাশিস সেনগুপ্ত

[লেখক পরিচিতি : ইংরেজি রহস্য গল্পের এক অতি জনপ্রিয় নাম জ্যাক রিচি। ১৯২২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার মিলাইউকিতে রিচি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রিচির বাবা ছিলেন দর্জি। মা ইরমা ছোট গল্প লিখতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রিচি, ইউ এস আর্মিতে যোগদান করেন। সেই সময় রিচি প্রচুর গল্পের বই পড়তেন। তার মধ্যে বেশিরভাগ বই গোয়েন্দা কাহিনি আর রহস্যের। এর ফলে রিচি ক্রমশ এই ধরনের সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পরেন। যুদ্ধ শেষে রিচি বাড়ি ফিরে আসেন। বাবার পেশাকে রিচি কোনও দিনই পছন্দ করেননি। তাই তিনি গল্প লিখবেন বলে মনস্থির করলেন। রিচির প্রথম গল্প ''অলওয়েজ দ্য সিজিন' প্রকাশিত হয়, ১৯৫৩ সালে নিউ ইয়র্ক ডেইলিতে। আর প্রথম গল্পেই বাজিমাত। রিচি জীবনে বহু ছোটগল্প লিখেছেন। তার মধ্যে ডেভিল আইস, বুলেট প্রুফ, অ্যানিভারসারি অফ ডেথ, চিকেন চার্লি (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওপর লেখা) গল্পগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে যে গল্পটি অনূদিত হয়েছে, এই গল্পটি ১৯৬০ সালে সাসপেন্স পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাসপেন্সের সেই সংখ্যায় যে ক'টি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল, তার মধ্যে আলফ্রেড হিচককের পছন্দের তালিকায় এই গল্পটি ছিল সর্বপ্রথম। ১৯৯৩-এর ২৮ এপ্রিল রিচির জীবনাবসান হয়।]

ভোর পাঁচটা। এখনও বাইরে ভালো করে আলো ফোটেনি। দোকানের বন্ধ কাচের দরজার ওপাশে আবছা আলো-আঁধারি। দোকানের ভেতরটা বড্ড বেশি গুমোট। তাজা হাওয়া আসার জন্যে আমি মস্ত কাচের দরজার একটাপাল্লা খুলে দিলাম। একঝলক পরিষ্কার ঠান্ডা বাতাস হুমড়ি খেয়ে পড়ল দোকানের ভেতর।

আমি নিজের জায়গায় ফিরে এলাম। আয়েস করে একটা সিগারেট ধরালাম। গুঁড়ো দুধের পেটির ওপরে বসলাম ধপ করে। আর ঠিক তখনই ব্যাপারটা ঘটল।

আলো আঁধারি ফুঁড়ে টুপি মাথায় একটা লম্বা লোক খোলা দরজা পেরিয়ে দোকানে ঢুকে পড়ল। লোকটির পরনে দোমড়ানো পিনস্ট্রাইপ সুট, লম্বাটে নীরস মুখ। চেহারায় আলাদা কোনও বৈশিষ্ট্য

নেই। সাদামাটা।

আমি হাহা করে বলতে গেলুম, এখন দোকান বন্ধ, দয়া করে দোকানে ঢুকবেন না। কিন্তু, আমার মুখের কথা মুখেই সেঁটে রইল। কারণ, আগন্তুকের প্যান্টের ফুলে থাকা ডান পকেট আমাকে অন্য এক অশুভ সংকেত দিচ্ছিল!

আগন্তুক তেরছাভাবে দাঁড়িয়ে, বুড়ো আঙুলের সামান্য চাপে বন্ধ করল দরজার 'ইনারলক'।

তারপর হালকা হাসল, 'এই সময়টার জন্য আমি সে-এ-এ-এ-এই রাত একটা থেকে অপেক্ষা করে আছি।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে বললাম, 'আপনি কী চাইছেন বলুন তো?'

আগন্তুকের ডান হাত পকেটে না ঢুকে পকেটের চেরা জায়গার কাছে গিয়ে থিতু হল—চোখের ইশারায় টাকা রাখার সিন্ধুকটাকে দেখিয়ে বলল, 'ওটার মধ্যে কত মালকড়ি আছে?'

'আমি জানি না।'

'এই ধরো হাজারখানেক?'

'আমার কোনও ধারণা নেই।' আমি মাথা ঝাঁকালাম, 'টাকাপয়সা গোনা আমার কাজ নয়।'

আগন্তুক এবার আমাকে খুব সতর্কচোখে মাপল , 'তাহলে তোমার এখানে চাকরিটা কী?'

'আমি এই দোকানের রাতের মালপত্রের পাহারাদার।'

আগন্তুকের মুখে বিদ্রূপের হাসি, 'আমি মনে করি তোমার মতো একজন মধ্যবয়সি লোকের এধরনের ফালতু কাজ করা একদম উচিত নয়।'

'এই কাজের বিনিময়ে আমি টাকা পাই।'

এইবার আগন্তুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে আসল মালটা বার করে আনল। থ্যাবড়া নাক, ০.৪৫ অটোমেটিক রিভলভার।

আমি আঙুলের ফাঁকে ধরা সিগারেটটা মেঝেতে ফেলে দিলাম, 'আমাকে কী করতে হবে বলুন তো? সিন্দুক খোলার কায়দাটা আপনাকে বলে দিতে হবে? শুনুন আমি কিন্তু সিন্দুক...।'

'থামো!' আগন্তুক ধমক দিল। ০.৪৫ অটোমেটিকটা একবার উরুতে ঘসে নিয়ে বলল, 'আমি কি এতই উজবুক যে, তোমার কাছে সিন্দুক খোলার নম্বর জানতে চাইব। আমি খুব ভালো করেই জানি, সিন্দুক খোলার নম্বর তুমি জানো না। আমি শুধু জানতে চাই, তোমার ম্যানেজার কখন এখানে আসবে?'

'সাড়ে সাতটা নাগাদ।'

'দোকান কখন খুলবে?'

'ঠিক আটটায়।'

এইবার আগন্তুক একটা মালভরতি পেটির ওপর বসে পড়ল। কবজি উলটে দেখল। তারপর চোখের দৃষ্টি সরিয়ে এনে আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমাদের হাতে এখনও বেশ কিছুটা সময় আছে। এই ফাঁকে তোমার সঙ্গে কিছুটা বাতচিত সেরে ফেলা যেতে পারে। আচ্ছা, এখানে তোমার কাজটা ঠিক কী বলো তো?'

আমি টেনশন কাটাতে আর একটা সিগারেট ধরালাম। তারপর বললাম, 'রাত ন'টায় দোকান বন্ধ হওয়ার ঠিক পরেই আমার কাজ শুরু। আমি তখন মালের ট্রাক খালি করি। ট্রাক চলে যাওয়ার পর, আমি সমস্ত মালে দোকানের স্ট্যাম্প লাগাই, নম্বর দিই। তারপর নম্বর অনুযায়ী সমস্ত মাল পরপর তাকে সাজিয়ে রাখি। সারারাত ধরে এটাই হল গিয়ে আমার কাজ।

'একদম মাথা খারাপ করা কাজ।'

'অবশ্যই।' আমি সিগারেটটা ধরিয়ে বললাম, 'তবে সান্ত্বনা একটাই, এই কাজটা আমাকে খাবার জোগায়।'

আগন্তুক হাতের আগ্নেয়াস্ত্রের সেফটি ক্যাচে ইন-আউটের খেলা দেখাতে-দেখাতে বলল, 'তুমি কী দিনেরবেলাও এখানে থাকো?'

'না। দিনে আমার ছুটি।'

আগন্তুক উঠে দাঁড়াল। দেওয়ালের হুকে টাঙানো এক সাদা অ্যাপ্রনের মধ্যে একটা বেছে নিয়ে গায়ে চাপাল। পিস্তলটা চলে গেল পেছনের পকেটে। আগন্তুকের মুখে হালকা হাসি। ভাবখানা এই, ও যেন এই দোকানের একজন কর্মচারী।

'শোনো হে।' আগন্তুক প্যান্টের পেছন পকেটে চাপড়াল, 'হঠাৎ আবার সাহসী হতে যেও না। বুঝেছ?'

আমি নিঃশব্দে মাথা নাড়লাম।

আগন্তুক আমাকে সামান্য ঠেলে দিয়ে বলল, 'চলো হে, এবার দোকানের পেছন দিকটা একবার মেপে নেওয়া যাক।'

আমরা দুজনে পায়ে-পায়ে দোকানের পেছন দিকে চলে এলাম।

আগন্তুক শ্যেন দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল। নাক কুঁচকে বলল, 'এঁঃ! জায়গাটা এক্কেবারে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে রেখেছ!'

'এখানে সব খালি বাক্স, আর হাবিজাবি জিনিসে ভরতি। কাজের শেষে এসব আবর্জনা আমি জায়গা মতো পাচার করে দিই।' বলতে-বলতে আমি তাকের ওপর থেকে একটা হুক পেড়ে আনলাম। বললাম, 'এটা পেটিগুলো খোলার জন্যে।'

'জানি।' আগন্তুক আড়মোড়া ভাঙল, 'তুমি তোমার মতো কাজ করো। বলে একটা সেলফে হেলান দিল। দেখতে লাগল। কীভাবে আমি পেটিগুলো খুলছি।

পেটি খোলার কাজ এক সময় শেষ হল। এইবার আমি রবার স্ট্যাম্পটা নিয়ে পড়লাম। স্ট্যাম্প কালি লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের জিনিসের গায়ে লাগাতে থাকি।

প্রায় মিনিটপনেরো পরে আগন্তুক ফের বলল, 'আচ্ছা, দোকানের এতরকম আইটেমের দাম তুমি কীভাবে মনে রাখো?'

'দীর্ঘ দিনের অভ্যেস। ঠিক মনে থাকে।'

'কী করে মনে থাকে?' নিশ্চয়ই এর একটা কায়দা আছে। কায়দাটা কী?'

'কায়দাটা তেমন কিছু নয়।' আমি নম্বর অনুযায়ী মালের গায়ে দাম ফেলি। আর এই নম্বরগুলো আমার মনে গেঁথে যায়।'

'আচ্ছা কোনও মুখকে তুমি যদি একবার দ্যাখো, দ্বিতীয়বার সেই মুখকে দেখলে তুমি চিনতে পারবে?'

'কখনও-কখনও আমি নিজের ভাইয়ের মুখই মনে রাখতে পারি না, তো অন্যের মুখ। তা ছাড়া এই দোকানের মাল আমার বাবার সম্পত্তি নয়, যে একে বুক দিয়ে আগলে রাখতে হবে। আপনি ইচ্ছে করলে আবার এই দোকানে আসতে পারেন। কথা দিচ্ছি, আমি আপনাকে চিনতেও পারব না।'

কাচের দরজার ওপাশে একজন পথচারী চলতে-চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে

গেল। দোকানের ভেতরে তাকাল।

আগন্তুক চটপট পেটি থেকে একটা কৌটো তুলে নিল। কৌটোটা দেখার ভান করতে-করতে ফিসফিস করে বলল, 'লোকটা কী চায়?'

'কিছু নয়।' আমি বললাম, 'এ সময় অনেক লোক তাদের রোজকার ধান্দায় বেরোয়। ওই লোকটা নির্ঘাত তাদেরই একজন।'

লোকটা চলে যেতেই আগন্তুক কৌটোটা একবার নেড়েচেড়ে সেটাকে আবার পেটির মধ্যে রেখে দিল।

আমি এবার একটা সেলফের কোণা থেকে পুরোনো দামের লেবেলটা তুলে ফেললাম। নতুন দামের লেবেলটা সাঁটাতে-সাঁটাতে বললাম, 'সকাল ঠিক সাড়ে ছ'টায়, এই পথে একজন পুলিশ ইনসপেক্টার যায়।'

আমার কথা শুনে আগন্তুক শক্ত হয়ে গেল। ওর চোখে ভয়। মনের হাসি মুখে না এনে বললাম, 'ব্যাপারটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। রোজকার নিয়ম এটা।'

আগন্তুক বলল, 'শোনো, যদি আমি বিপদে পড়ি, তাহলে এখানে কিন্তু রক্ত ঝরবে। কথাটা মনে থাকে যেন।'

'চিন্তার কিছু নেই।' আমি সহজ ভাবে বললাম, 'ও-দিক থেকে কোনও বিপদ আসবে বলে আমার মনে হয় না।'

'আমি চাই, তুমি এই দোকানে আরও বহুদিন ধরে বহাল তবিয়তে চাকরি করো।'

আমি আগন্তুকের দিকে তাকালাম, 'সত্যি কথা বলতে কী, আমিও তো সেটাই চাই।'

আগন্তুক ইতিউতি তাকাল। ওর চঞ্চল চোখ গিয়ে স্থির হল দোকানের পেছন দিকের বন্ধ দরজায়।

'শোনো হে।' আগন্তুকের ঠোঁটে ফিঁচেল হাসি, 'তোমার অনুমতি ছাড়াই আমাকে পেছনের দরজাটা খুলতে হবে দেখছি। সময় হলেই ওই পথে আমি পিঠটান দেব।'

আমি অ্যাপ্রনে হাত মুছলাম। কিন্তু কোনও উত্তর দিলাম না।

আগন্তুক এগিয়ে এসে আমার থুনতিতে টোকা মারল, 'অ্যাত চিন্তার কী আছে? একটু চেষ্টা করলেই এর থেকে হাজারগুণ ভালো কাজ এ-বাজারে পাওয়া যায়।' কথার ফাঁকে আগন্তুকের দৃষ্টি চলে গেল সিন্দুকের দিকে। আপন মনে সে বিড়বিড় করতে লাগল, 'যেমন দোকান, তার তেমনি কর্মচারী। সিন্দুকে মালকড়ি কত আছে কে জানে? খাটুনিটা বৃথা না যায়।'

একটু বাদেই বিশাল শরীর নিয়ে ইনসপেক্টার লারকিন দোকানের শোকেসের সামনে এসে দাঁড়াল। হাতের মস্ত থাবায় ঘাড়ের পেছন দিকটা আচ্ছা করে ঘসতে-ঘসতে লম্বা হাই তুলল।

লারকিনকে দেখামাত্রই, আগন্তুক তাড়াতাড়ি পেটি থেকে কয়েকটা কৌটো তুলে নিয়ে সেলফে সাজাতে-সাজাতে নীচু গলায় বলল, 'তুমি এখন কী করবে? ওঁর কাছে সাহায্য চাইবে?'

'ওঁকে আমার কোনও প্রয়োজন নেই।' আমি বললাম। চোখের কোণা দিয়ে লারকিনের দিকে তাকালাম। লারকিনের বিশাল ভুঁড়ির ঠিক ওপরে, ওর পুলিশি নম্বরের ব্যাজ জ্বলজ্বল করে দুলছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে লারকিন চলে যেতেই আগন্তুক সেলফে মাল সাজানোর কাজ বন্ধ করল।

'ও এখন কফি খেতে গেল।' আমি আগন্তুকের চোখে চোখ রাখলাম, 'কফি খেয়ে ও এ-পথেই ফিরবে। তারপর ওই কোণার টেলিফোন বুথ থেকে একটা ফোন করবে। এটাই ওর ডেলি রুটিন।'

'মামার রুটিনটা আজকেও যেন ঠিকঠাক থাকে।' আগন্তুক কঠিন গলায় বলল, 'শোনো ভায়া, তুমি কিন্তু তোমার খেলাটা খুব সহজভাবে খেলবে। কোনওরকম ভাজাভাজি নয়। মাথায় রাখবে—আমি তোমার সঙ্গেই আছি।'

আমি আবার একটা সিগারেট ধরালাম। লম্বা টানে ধোঁয়া বেরোল নাক আর মুখ দিয়ে। আমার দৃষ্টি উড়ন্ত ধোঁয়ার দিকে। আর মাথায়...

চিন্তার জগৎ থেকে আমি বাস্তবে ফিরে এলাম। রবার স্ট্যাম্পটাকে চক্রাকারে ঘুরিয়ে একটা নম্বরে নিয়ে এলাম। স্ট্যাম্পে কালি লাগালাম। বড় টম্যাটো জুসের কৌটোগুলোতে নম্বর দাগিয়ে কৌটোগুলো পরপর সাজিয়ে দিলাম জানলার কাছে, ডিসপ্লে সেলফের তাকে।

মিনিটকুড়ি বাদে লারকিন আবার যখন ঘুরে এল, তখন আমার কাজ শেষ।

লারকিন কিছুক্ষণ ডিসপ্লে সেলফের কাছে দাঁড়াল। আমার দিকে তাকাল। আমি একমনে ঝাড়ন দিয়ে ধুলো ঝাড়ছি। আমি যখন চোখ তুললাম ততক্ষণে লারকিন হাওয়া।

সওয়া সাতটা নাগাদ আমি হাতের কাজ গুছিয়ে গায়ের অ্যাপ্রন খুললাম।

'এর পর?' আগন্তুক জানতে চাইল।

'কিছু না। আমার কাজ শেষ। ম্যানেজার এলেই আমি চলে যাব।'

মরিসন এল পাঁচমিনিট দেরিতে। সে যখন বন্ধ দরজার কাছে এসে দাঁড়াল, তখন ঘড়িতে ঠিক সাতটা পঁয়ত্রিশ।

আগন্তুক খোলা পিস্তল হাতে দরজার আড়ালেই দাঁড়িয়ে ছিল। মরিসন দরজার কাছে দাঁড়াবার সঙ্গে-সঙ্গে, আগন্তুক ঝটিতি ল্যাচ-কি ঘুরিয়ে দরজা খুলল। হাত বাড়িয়ে মরিসনকে ভেতর টেনে নিল, দরজা বন্ধ করে 'ইনার-লক' টিপে দিল। এসব ঘটে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

মরিসনের মুখ এখন মৃত মানুষের করোটি।

এই যে ভায়া, এবার নিশ্চয়ই সিন্দুকের কাছে যাওয়া যেতে পারে। কী বলো? আগন্তুক পিস্তলটা মরিসনের নাকের কাছে নিয়ে এল।

নাকের ডগায় পিস্তল থাকলে কোনওরকম যুক্তিতর্ক চলে না। মরিসনও এর ব্যতিক্রমী নয়। গুটিগুটি পায়ে আমরা তিনজন সিন্দুকের কাছে এসে দাঁড়ালাম। মরিসনের আঙুল থরথর করে কাঁপছে। তবুও সে একবারের চেষ্টাতেই সিন্দুকের নম্বর মিলিয়ে দিল।

আগন্তুক সিন্দুকের ভেতর থেকে একটা ধূসর রং-এর খালি ক্যানভাসের থলি বার করে আনল। মুঠো-মুঠো টাকা ঢুকে গেল থলের ভেতর। আগন্তুক সিধে হল। হাত বাড়িয়ে সামনের সেলফে রাখা শক্ত দড়ির গোলাটা সে টুক করে তুলে নিল। এবার কী হবে তা আমি জানি।

'তোমরা এবার লক্ষ্মীছানার মতো দোকানের একদম পেছন দিকে চলে যাও!'

বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা দুজন সুবোধ বালকের মতো আগে। পেছনে আগন্তুক।

দোকানের পেছন দিকে গিয়ে আগন্তুক দড়ির গোলাটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিল।

পিস্তল উঁচিয়ে বলল, 'ওঁকে বেঁধে ফ্যালো।'

হুকুমের সঙ্গে-সঙ্গে আমার কাজ শুরু। মরিসনের পর আমার পালা। আগন্তুক আমার সঙ্গেও কিন্তু খুব একটা ভালো ব্যবহার করল না। সে চটপট আমাকেও বেঁধে ফেলল।

কাজ হাসিল করে আগন্তুক হাসল। বড়ই তৃপ্তির হাসি। এবং সে সেই মুহূর্তে দোকানের পেছনের দরজা খুলল...।

খোলা দরজার ওপাশে ওঁরা সবাই আগন্তুককে সাদর অভ্যর্থনা জানাল।

লারকিনের সঙ্গে আরও ছ'জন। সবার হাতে উদ্যত .৩৮ সার্ভিস স্পেশাল। আগন্তুক ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। যন্ত্রের মতো দু-হাত উঠে গেল ওপর দিকে। ধূসর থলে বগলের তলা থেকে খসে পড়ল কঠিন মেঝেতে।

ন'টার কিছু পরে আমি অ্যাপ্রন ছেড়ে গায়ে জ্যাকেট চাপালাম।

মরিসন বলল, 'উইলি, তোমার পদোন্নতির জন্যে আমি নিশ্চয়ই করে তোমার নাম ওপরওয়ালার কাছে সুপারিশ করব।

'ধন্যবাদ, মিঃ মরিসন।' আমি জ্যাকেটের চেন টানলাম।

'সব মানুষের জীবনে একটা করে সুন্দর সময় আসে।' মরিসন হাসল, 'উইলি তোমার জীবনে সেই সুন্দর সময়টা হল আজ। তুমি আজ কোম্পানির প্রায় পনেরো হাজার ডলার বাঁচিয়ে দিয়েছ। সেই কারণে তোমাকে পাঁচশো ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে।'

আমি দ্বিতীয়বার মরিসনকে ধন্যবাদ জানালাম।

ইতিমধ্যে গুড়ের গন্ধ পাওয়া মাছির মতো কয়েকজন সাংবাদিক দোকানে এসে হাজির।

লারকিন আবার নতুন করে তার গল্প শুরু করল।

'প্রথমেই একটা ব্যাপারে আমার খটকা লেগেছিল।' লারকিন বিজ্ঞের মতো বলল, 'ডিসপ্লে সেলফে রাখা সমস্ত টম্যাটো জুসের কৌটোর মাথা নীচের দিকে কেন! এরকম তো হওয়ার কথা নয়! কারণ দীর্ঘ দিন ধরে আমি এই দোকানের সঙ্গে পরিচিত। এরকম ভুল আমি এর আগে কখনও দেখিনি। আমার কীরকম সন্দেহ হল। পুলিশের কাজই হল, সব কিছু সন্দেহের চোখে দেখা। কৌতূহলবশত আমি আর-একটু কাছে গেলাম। দেখলাম প্রতিটি ওলটানো কৌটোর গায়ে আমার পুলিশি ব্যাজ নম্বর দেওয়া। বুঝতে পারলাম, দোকানের ভেতর কোনও গোলমাল পাকিয়ে আছে। ব্যস, আমি দুয়ে-দুয়ে চার মিলিয়ে দিলাম।' লারকিনের গল্প এখানেই শেষ। আমি টুপি মাথায় দিলাম।

মরিসন এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রাখল, 'ঠিক আছে উইলি। রাতে আবার দেখা হবে। তুমি ঠিক সময় আসছ তো?'

'অবশ্যই মিঃ মরিসন।' আমি উত্তর দিলাম, 'আমি ঠিক রাত ন'টার মধ্যেই এখানে চলে আসব।' আমি সামান্য হেসে সিন্দুকটা পেরিয়ে গেলাম। ক্ষণিকের থমক। 'মিঃ মরিসন।' আমি মনে-মনে বললাম, 'আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ। সিন্দুক খোলার নম্বরটা আমি কিন্তু একদম আমার মাথায় গেঁথে নিয়েছি। ত্রিশ থেকে ডানদিকে। তারপর চাকাটা সম্পূর্ণ বাঁ-দিকে ঘুরে তলায় এসে থামবে।'

বাসস্টপে পৌঁছে আমি আবার একটা সিগারেট ধরালাম।

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে নিজেই নিজেকে বললাম, 'কী ভাবছ উইলি? আগামী দিনে হঠাৎ করে হয়তো তোমার হাতে বেশ কিছু টাকা চলে আসতে পারে। সেটা পনেরো হাজার ডলার, কিংবা তার থেকে আরও বেশি হতে পারে। এখন তোমার কাজ শুধু অপেক্ষা করে থাকা। সেই সময়, আর সুযোগের। তাই না?'

ছবি সুদীপ্ত দত্ত

টুকরো খবর

সংস্কৃত এক বাচিক শিল্পী সংঘ। ৩০শে মে অবনমহলে তারা আয়োজন করল আবৃত্তি-শ্রুতিনাটকে ভরা এক সন্ধ্যার। বাদ যায়নি যোগা, সঙ্গীত ও নৃত্যও। প্রধান অতিথি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী দেবেশ দাস। সম্বর্ধনা দেওয়া হয় আনন্দবাজার ও দ্য টেলিগ্রাফের চিত্র সাংবাদিক অরণ্য সেন ও কিঞ্জল পত্রিকার সম্পাদক চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে। আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটক সবক'টি উপস্থাপনাই প্রশংসাযোগ্য।

রণিত দাশগুপ্ত

হাঁপানি বা অ্যাজমা (asthma) কী?

কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দিনকে দিন বেড়ে যাচ্ছে। ছোটখাটো অসুখবিসুখে সবসময় হাতের কাছে ডাক্তারও পাওয়া যায় না। সেই জন্যই কলম ধরেছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক বিশেষজ্ঞ

ডাঃ মহুয়া দাশগুপ্ত
এম.বি.বি.এস., ডি.সি.এইচ.

প্রিয় বন্ধুরা,

আমরা হাঁপানি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। হাঁপানির লক্ষণগুলো কী?

১। শুকনো কাশি, ২। শ্বাসকষ্ট।

একটু বড় বাচ্চারা এবং বড়রা বলে দম ফুরিয়ে যাচ্ছে বা বুকে কষ্ট হচ্ছে বা ব্যথা হচ্ছে। শ্বাস নিতে অসুবিধে হচ্ছে।

ডাক্তারবাবুরা পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন হাঁপানি হচ্ছে কি না বা অন্য কোনও কারণে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কি না।

ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় খেলতে-খেলতে বা কাজ করতে-করতে হাঁপানির সূত্রপাত হয়েছে।

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে, বা কায়িক শ্রম বা রাতের বেলাতেও হাঁপানি শুরু হতে পারে।

চিকিৎসা ঃ ১) অহেতুক ভয় না পাওয়া। এই অসুখটি অনেক ক্ষেত্রে সেরে যায়। অনেক ক্ষেত্রে বাড়া কমা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে-যেতে আস্তে-আস্তে কমে আসে বা প্রশমিত হয়ে যায়।

২) সুচিকিৎসার প্রয়োজন। শিশুদের বৃদ্ধি না-হলে ব্যাহত হতে পারে।

৩) চিকিৎসা দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তাৎক্ষণিক ও দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসা।

তাৎক্ষণিক চিকিৎসা রোগীকে আরাম দেওয়ার জন্য। অসুখটি প্রশমিত করার জন্য। অল্প-অল্প হাঁপানি ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ইন্‌হেলারের মাধ্যমে ওষুধ দিলেই সেরে যায়। খুব অবস্থা খারাপ হলে ভরতি করতে হতে পারে। অক্সিজেন, ওষুধ দেওয়া হয়।

ইন্‌হেলার কেন?

অসুখটা যেহেতু লাঙসে (ফুসফুস) অতএব ইন্‌হেলারের মাধ্যমে ওষুধ দিলে ওষুধের কাজ তাড়াতাড়ি হয় এবং বেশি কার্যকরী হয়। তা ছাড়া, মুখে খেলে বা ইন্‌জেকশন নিলে যে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে তার সম্ভাবনাও অনেক কমে যায়।

ক্রনিক চিকিৎসা ঃ যারা প্রায়ই হাঁপানিতে কষ্ট পায় তাদের ক্ষেত্রে লম্বা চিকিৎসা জরুরি হয়ে যায়। এই সব ওষুধগুলোর মধ্যে যেমন প্রদাহ কমানোর ওষুধ থাকে তেমনি অ্যালার্জি প্রতিরোধ করার ওষুধও থাকে। কিছু ওষুধ শ্বাসনালীকে প্রসারিত করে রাখে ফলে হাওয়া চলাচলে অসুবিধে হয় না।

কেন ক্রনিক চিকিৎসা দরকার?

না-হলে রোগী অহেতুক বারেবারে কষ্ট পাবে। স্কুল, কলেজ, অফিস কামাই হবে। কাজ করতে পারবে না। ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হবে।

স্টেরয়েড-এর প্রয়োজনীয়তা ঃ হাঁপানিতে ফুসফুস ও শ্বাসনালীর প্রদাহ হয়। এই প্রদাহ কমানোর জন্য মাঝে-মাঝে স্টেরয়েড দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে স্টেরয়েড অনেক সময়ই জীবনদায়ী (life saving drug) ওষুধ বলে পরিগণিত হয়।

স্টেরয়েড ওষুধ অনেক সপ্তাহ ধরে খেলে বিভিন্ন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়। তাই যেখানে এটি লম্বা চালানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে সেখানে ইন্‌হেলারের মাধ্যমে দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে কাজও যেমন ভালো হয়, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও তেমন প্রায় হয় না।

সঠিক চিকিৎসায় রোগের প্রকোপ কমে। কাজকর্মে অসুবিধে হয় না। শুধু কিছু ওষুধ সময়মতো নিতে হয়। আজকাল এই জাতীয় ওষুধের বেশিরভাগেরই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম। কিছু ওষুধ যেমন ঘুমের ওষুধ, সিডেটিভ, বিটা ব্লকার এদের দেওয়া যাবে না।

চিকিৎসক এবং রোগী দুজনের সহযোগিতা এই জাতীয় অসুখের ক্ষেত্রে দরকার।

সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ দৃশ্য

সিদ্ধিদাদুর বয়স এখন প্রায় ছিয়াত্তর-সাতাত্তর। টুকটুক করছে তাঁর রং—ঠিক যেন একটি পাকা আম। বিয়ে করেননি, কিন্তু সংসারে তাঁর একটুও বিরাগ নেই। ভাগ্নের সংসারে একাত্ম হয়ে আছেন। খুঁটিনাটি সব বিষয়ে তাঁর আগ্রহ। কাজের লোক নিত্য আসছে-কি-আসছে না থেকে রন্টুর ব্যাগের স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেল কি না সবেতেই তিনি সজাগ থাকেন।

রন্টু তাঁর ভাগ্নের ছেলে। বলতে গেলে সিদ্ধিদাদুর গলার হার শিশুটি। ক্লাস টু-তে পড়ে। ওরা যা কিছু আবদার সব দাদুর কাছে। অবেলায় রং পেনসিল ফুরিয়ে গেছে, দাদু এনে দেবে, কুড়কুড়ে খাবে—তা-ও দাদু আনতে ছুটবে। সিঁথির মোড়ে সার্কাস এসেছে—দাদু দেখাতে নিয়ে যাবে। গল্প পড়া ও শোনা রন্টুর বাতিক। তার প্রায় সব গল্পের জোগানদার এই দাদু। কলেজ স্ট্রিটের বইয়ের দোকান থেকে অনেক গল্পর বই রন্টুর জন্য দাদু এনে দিয়েছে। তবু রন্টুর চাহিদা মেটে না।

—আরও গল্প বলো দাদু। তোমার মুখ থেকে গল্প শুনব। সেবার দিঘায় গিয়ে রোজ যেমন গল্প বলতে, তেমনই তোমায় বলতে হবে।

একবার বায়না আরম্ভ হলে রন্টু আর থামতে চায় না। রন্টুর মা শুনতে পেলে তেড়ে আসেন। ছেলেকে চড়-চাপড়ও দু-একটা দিয়ে দেন। সেই আক্রমণ থেকে বাঁচানোই দাদুর দায়। তাই আগে থেকে তিনি পরিস্থিতির সামাল দেন। বলেন,—হবে, হবে। রাত্তিরে হবে। তোর খাওয়াদাওয়ার পর কার্টুন দেখা হয়ে গেলে আমি গল্প বলব। তবে আগে সন্ধের সময় মা-র কথামতো পড়াশুনো ঠিকঠাক করে ফেলবে। তা না হলে গল্প হবে না।

দাদুর আশ্বাস পেয়ে রন্টু মাথা নেড়ে বলে,—নিশ্চয় পড়ব। সে তুমি ভেব না। কিন্তু গল্প আজ তোমায় বলতেই হবে।

স্কুল থেকে ফেরার পর দাদুর সঙ্গে এইসব কথার পর রন্টু বেরিয়ে যায় পাড়ার পার্কে। তিন থেকে বড় জোর পাঁচটি বন্ধু রন্টুর। তবে দোলনায় চড়া, চোর-পুলিশ খেলা—এর বেশি কিছু খেলা তার ধাতে সয় না। তার মনটা কল্পনাপ্রবণ। সে কেবল গল্প খোঁজে। রন্টু তাই সমবয়সিদের থেকে একটু যেন আলাদা। টিভির পরদার সামনে বসতে তার বন্ধুদের এখন বেশি ভালো লাগে। হরেকরকম মজার জিনিস তারা টিভির বাক্সতেই পায়। রন্টুও টিভি দেখে, কিন্তু তাতে তার মন ভরে না। সে গল্প চায়—গল্প, আরও গল্প।

পার্ক থেকে বাড়ি ফিরে রন্টু এদিন তাড়াতাড়ি পড়তে বসে গেল। মা অবাক হলেন না, মনে-মনে ভাবলেন। আজ রন্টুর কোনও মতলব এঁটেছে। সিদ্ধিদাদু রাতের খাবার খান ন'টা নাগাদ। রন্টু সেই সময়টাতে আবার দাদুর সামনে এসে হাজির হয়।

—কী হল রন্টু?

গল্প বলবে তো?

—নিশ্চয়ই বলব। রোববারে কথা দিয়েছিলুম যে গল্পটা বলার, সেই গল্পটাই বলব। খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি।

রন্টু এক লাফে মার দিকে ছুটে যায়,—খেতে দাও এখনই।

—দিচ্ছি বোস।

তিন মিনিটে খাওয়া শেষ। তারপরই ছুটে গিয়ে দাদুর বিছানায় উঠে বসে।

দাদুর জিগ্যেস করে,—ভয় পাবি না তো?

—ভয়ের কোনও ব্যাপার নেই। তুমি বলো।

—তাহলে আরম্ভ করছি গল্পটা।

দাদু দুটো লবঙ্গ মুখে দিয়ে গল্পটা শুরু করল,—আমার বয়স তখন কত হবে—

দশ-এগারোর মতো। ক্লাস ফাইভের পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্ট বেরোবার পর দেওঘর গিয়েছিলুম পিসিমাদের সঙ্গে। পিসিমাদের মস্ত বড় সংসার। পিসেমশাই, পিসিমা, পিসতুতো তিন ভাই, দুই বোন, ওদের বাড়ির দু-তিনজন কাজের লোক নিয়ে আমরা হাওড়া স্টেশনে গিয়ে তুফান এক্সপ্রেসে চেপে বসলুম। গন্তব্য দেওঘর। প্রথম গিয়ে নামলুম জসিডি স্টেশনে। সেখান থেকে ট্রেন বদল করে বৈদ্যনাথ ধাম স্টেশনে যেতে হল। শীতের বিকেল। ধোঁয়া-ধোঁয়া ভাব।

স্টেশনটা ছোট হলেও অনেক সাজগোজ করা লোক নামলেন প্ল্যাটফর্মে। তাঁদের অভ্যর্থনা করার লোকও ছিল। আমাদেরও অভ্যর্থনা করলেন স্থানীয় এক ভদ্রলোক। পিসেমশাইয়ের অফিসের তরফে পরিচিত ওই ভদ্রলোকটি স্টেশনে আমার গাল টিপে আদর করেছিলেন, তা এখনও মনে আছে।

ভদ্রলোক একটা ঢাউস মোটরগাড়িতে আমাদের তুলে নিয়ে নামালেন একটা বিশাল বাড়িতে। যতদূর মনে আছে বাড়িটা ছিল বমপাস টাউনে। অত বড় বাড়ি ও তার চারদিক ঘিরে অত বড় এলাকা দেখে আমরা সবাই চমকে গেলুম। বাড়িটাকে ঘিরে বিরাট বাগান। হরেক রকম ফুলের গাছ। ফলের গাছও ছিল অনেকগুলো। পিছন দিকে বাঁধানো উঠোন। বড় ইঁদারা। উঠোনে সিমেন্ট দিয়ে তৈরি অনেকগুলো বেঞ্চ। এলাহি ব্যাপার। বিকেলটা গেল ওইসব ঘুরে দেখতে। বাড়ির ভেতরটায় পেল্লায় সব ঘর। এ-ঘর থেকে ও-ঘর যেতে সব গোলমাল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। যেন ভুলভুলাইয়া। চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

আমাদের সঙ্গে ছিল পিসিমার দেওরের ছেলে, আমাদের শঙ্কুদা। খুব দাদা-দাদা ভাব তার। আমার দিকে তাকিয়ে বলল,—কোথায় এসেছিস ভাব একবার। তুই এখানে শিশু, দেখিস হারিয়ে যাসনি যেন।

পিসিমা আমাকে আগলে রাখতে গোড়া থেকেই খুব তৎপর ছিলেন। বললেন, —নারে ভয়ের কিছু নেই। শঙ্কুর কথাই ওইরকম।

পিসেমশাই চশমার ফাঁক দিয়ে চারদিক পর্যবেক্ষণ করছিলেন। প্রতিটি ঘরে কতগুলো জানলা, কতগুলো দরজা, কুলুঙ্গি—এসব দেখেশুনে কোথায় কোন জিনিস রাখতে হবে সে ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

সিদ্ধিবাবু গলা ঝেড়ে নিয়ে তাঁর পিসেমশাইয়ের মতো করে যেন বলতে লাগলেন,—বড় লোকের বাড়ি, এন্তার সবকিছু করা রয়েছে। কোথায় কোন জিনিসটা রাখা হবে, তা ভালো করে দেখেশুনে না রাখলে কাজের সময় আসল জিনিস চোখে পড়বে না।...ওনার কথামতো আমাদের পুরো দলটা সবকিছু গুছিয়ে রাখতে লাগলুম।

পিসিমা এর মধ্যে রান্নার ঠাকুরকে (আমরা কাকু বলতুম) বললেন,—তাড়াতাড়ি উনুন ধরিয়ে চা-জলখাবার কর।

তখন তো আর গ্যাসে রান্না হত না, উনুনে রান্নার ব্যবস্থা করতে একটু সময় নিত। সেই মতো সব আয়োজন হতে লাগল।

কিছুক্ষণ বাদে চা, কুচো নিমকি, মিষ্টি, পেড়া এসে গেল। উৎকৃষ্ট এক ভোজনের পর বড়রা তাস আর ছোটরা লুডো নিয়ে বসে গেল। পিসেমশাই ভারী লেন্সের চশমা পরে কয়েকটা খবরের কাগজে মন দিলেন। তবে মাঝে একবার উঠে গিয়ে সবগুলো জানলা-দরজা ছিটকিনি, খিল ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করে দেখলেন। রাত্তিরে শুতে যাওয়ার সময় এগুলোতে গণ্ডগোল থাকলে মুশকিল হতে পারে, একথা ভেবেই হয়তো তিনি আগাম দেখে নিলেন।

পিসেমশাই কাউকে কিছু বলছিলেন না। কিন্তু বারবার জানলা-দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সেগুলো পরীক্ষা করে দেখছিলেন। তাঁর ওরকম ভাবে দেখার জন্য আমাদের মনে কৌতূহল জমা হচ্ছিল। ছোড়দি প্রশ্ন করলে পিসেমশাই বললেন,—তোরা নিজেদের কাজ কর। আমাকে সব দেখতে দে।

আমাদের মন অন্যদিকে সরাবার জন্য পিসেমশাই পরের দিনের বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা তুলে ধরলেন,—কাল সকালে প্রথমে নন্দনপাহাড় যাওয়া হবে। তারপর ছোটখাটো কিছু জায়গা ঘুরে দুপুরে খাওয়ার পর বিকেলে ত্রিকূট পাহাড় যাওয়া যাবে। বিশ্বনাথ মন্দির দর্শন হবে পরশুদিন। কেয়ারটেকারকে জিগ্যেস করতে হবে, টাঙা কোথা থেকে পাওয়া যাবে।

তারপরই পিসিমার দিকে তাকিয়ে রাতের খাবার তৈরির কথা বললেন।

সিদ্ধিদাদু রন্টুর লোভ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর সে রাত্তিরের ভোজনের খবর এবার দিতে লাগলেন,—জানিস, পিসিমা খুব ভালো একজন ঠাকুর নিয়ে গিয়েছিল। ঠাকুরকাকু বড্ড ভালো রান্না করত। সত্যি, সে রাত্তিরে গরম-গরম লুচি, আলুভাজা, ডিমের ডালনা, যা সব আমাদের পাতে পড়েছিল, ভাবলে এখনও জিভে জল আসে। হইহই করে আমরা খেয়ে নিলুম।

এরপর শুতে যাওয়ার পালা। শীতের রাত। সে সময়ে দেওঘরে শীতও পড়ত খুব। পিসিমা আমাকে আর শঙ্কুদাকে একই ঘরে শুতে দিলেন। চোখ বড়-বড় করে শঙ্কুদা আমার পাশে শুয়ে পড়ল। শুয়ে উসখুস করতে লাগল। একবার বসে, একবার ওঠে। তারপর উঠে পড়ে আলো জ্বালাল। ঘরের চারদিকে যতগুলো জানলা-দরজা ছিল, ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল। হাত ব্যাগ থেকে একটা টর্চ বার করে জানলা, দরজাগুলোর ওপর টর্চের আলো ফেলতে লাগল। আমি তো অবাক। ভয়ে-ভয়ে জিগ্যেস করলুম,—কী ব্যাপার, শঙ্কুদা?

—আশপাশ ভালো করে দেখে শুতে হয়। তুই ঘুমিয়ে পড়।

শঙ্কুদার মৃদু ধমকানি খেয়ে আমি পাশ ফিরে শুয়ে চোখ পিটপিট করতে লাগলুম। দু-চার মিনিট পরে ভান করলুম যেন ঘুমুচ্ছি। শঙ্কুদা আবার উঠল। টর্চের আলো ফেলল দরজা, জানলায়। আমি পাশ ফিরে শুয়ে সেদিকে নজর দিলুম। দেখলুম, সবক'টা জানলা-দরজায় লেখা আছে, 'রাম, রাম, রাম'। বুকটা দুরদুর করতে লাগল। কিছু বলতে পারলুম না। শঙ্কুদা একবার উঠছে, একবার বসছে, কিছুতে শান্তি পাচ্ছে না। এবার আমারও সেই অবস্থা।

সিদ্ধিদাদু এইখানে এসে একটু থামলেন।

—বলো দাদু, বলো, থেমো না। রন্টু চোখ বড়-বড় করে বলল।

দাদু আবার আরম্ভ করলেন,—আমি হুড়মুড় করে উঠে শঙ্কুদাকে আঁকড়ে ধরে জিগ্যেস করলুম,—এসব কথা জানলা-দরজায় লেখা কেন? কিছু বুঝতে পারছ?

—আস্তে-আস্তে বুঝতে হবে। ভয় করিস না।

মনে হল পাশের ঘরেও পটাপট আলো জ্বলে উঠল। সেখানেও গুঞ্জন। দরজা খুলে আমরা দুজনেই বেরিয়ে পাশের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলুম।

বড়দি, ছোড়দি, অর্থাৎ আমার দুই

পিসতুতো দিদি বেরিয়ে এল। তাদের ঘরের জানলা-দরজাগুলোতেও একই কথা লেখা আছে। আমাদের দেখাল।

সকলেরই ঘুমের দফারফা। উঁচু স্বরে কথা বলে, এটা-সেটা আলোচনা করে চেষ্টা করা হল ভয় কাটানোর। শেষে ঠিক হল, রাতটা যাক, সকালে রহস্যভেদের চেষ্টা করা হবে। আবার আমরা যে-যার ঘরে শুতে গেলুম।

সকালে উঠে কিছুটা যেন চাঙ্গা হলুম। রাতটাতে কিছু ঘটেনি দেখে সামান্য স্বস্তির ভাবও আমাদের মধ্যে দেখা দিল।

—দাদু, তোমরা তাহলে সকালে উঠে সব ভুলে গেলে? রন্টু জিগ্যেস করে।

—আগে শোন সবটা, তারপর কথা বলবি।...পিসিমা-পিসেমশাইকে বলা হলে ওনারা বললেন ওঁদের ঘরে এবং অন্য সব ঘরেই ওই সব লেখা আছে। ও তেমন কিছু নয়।

সিদ্ধিদাদু কিছুটা দম নিয়ে বলে যেতে লাগলেন,—সারাদিন বেড়ানো আর গল্পগুজব করে রাতের ভয় আমাদের কিছুটা কমেছিল। সন্ধে যত ঘনিয়ে আসতে লাগল, বুকের ভেতরটা আবার চঞ্চল হতে শুরু করল।

—থামছ কেন, বলো না। সিদ্ধিদাদু একটু থামতেই রন্টু তাড়া লাগায়।

—ভালো করে শোন। সন্ধে তখন হয়ে গেছে। চিড়েভাজা আর চানাচুরসহ চায়ের আসর জমে উঠেছে। এমনসময় স্বয়ং পিসিমা হন্তদন্ত হয়ে মুখ কালো করে ঘরে এসে ঢুকলেন। পিসেমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন,—তুমি একটা ভূতের বাড়িতে আমাদের এনে তুলেছ। বিশুর-মা চায়ের কাপ-ডিশ ধুয়ে রেখেছিল। একটু পরে ঘরে গিয়ে দেখে সব উধাও। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ব্যাপার মোটেই সুবিধের নয়।

পিসেমশাই ধীরস্থিরভাবে কথাগুলো শুনে বললেন,—দ্যাখো, তোমার বিশুর-মা অন্যকোথাও ভুল করে রেখেছে ওগুলো।

—ওই রকম তোমার কথা। একটু আগে রেখেছে, ভুল করবে কেন?

সিদ্ধিদাদু গলা আরও গম্ভীর করে বলতে লাগলেন,—আমরা অবাক। শঙ্কুদার মুখ কাঁদো-কাঁদো। তখনই বলে উঠল,—সিদ্ধিকে নিয়ে রাত্তিরে আমি ওই ঘরে শুতে পারব না।

পিসিমা আশ্বস্ত করলেন,—আজ আমি তোদের সঙ্গে শোব।

সিদ্ধিদাদু রন্টুর শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে আবার শুরু করলেন,—সেই সন্ধে আমাদের কাটতেই চায় না। বেড়ানোর আনন্দ কোথায় উধাও। বিরস মুখে রাতের খাওয়া শেষ করে শুতে গেলুম। পিসিমার বিছানা আমার খাটেই পাতা হল। ঘড়ির টিকটিক আওয়াজ আমার বুকে যেন ঠকঠক শব্দ তুলতে লাগল। তারপর বোধহয় হঠাৎ ঘুম এসে গিয়েছিল। একেবারে সকালে চোখে খুললুম।

সিদ্ধিদাদু মাঝে-মাঝে চুপ করে দম নিচ্ছিলেন।

—সকালবেলা রহস্যের আরও একদিক জানতে পারলুম। চা-জলখাবার খাওয়া হচ্ছে, এমন সময়ে পিসিমা এসে সোজা পিসেমশাইকে বললেন,—এ-বাড়িতে আর থাকা ঠিক হবে না। কাল রাত্তিরে রান্নাঘর থেকে আরও ডিশ-কাপ উধাও হয়েছে। চোর এলে তো আর কেবল চায়ের কাপ-ডিশ নিয়ে সন্তুষ্ট হত না। নিশ্চয় এ-বাড়িতে ভূতের উপদ্রব আছে। ডিশ-কাপের দিকে লোভ। কোনও মানুষের অতৃপ্ত আত্মা নিশ্চয়ই এর সঙ্গে জড়িত। এখন বুঝছ তো কেন দরজা-জানলায় 'রাম-রাম' লেখা।

রন্টুর মুখের চেহারার দিকে সিদ্ধিদাদু একঝলক দেখে নিলেন। গল্পটা যথেষ্ট জমিয়ে তুলতে পেরেছেন বুঝে দাদু চালিয়ে যেতে লাগলেন,—আমাদের তখন মনের অবস্থা বুঝছ তো দাদুভাই। রইল পড়ে বেড়ানো, দে ছুট অবস্থা। আমরা মুহ্যমান হয়ে বসে রইলুম।

পিসেমশাই দু-টিপ নস্যি নিয়ে খবরের কাগজ দেখতে লাগলেন। সারাদিন এমন ভাবে কাটল। কারও আর বেড়ানোয় মন ছিল না। তবু বিকেলের দিকে দুটো টাঙা করে অনেকটা পথ ঘুরে আসা হল। দূর থেকে পাহাড়ের দৃশ্য ভালোই লাগছিল।

বাড়িতে পৌঁছনোর আগে পিসেমশাই পথের ধারের মিষ্টির দোকানের মালিককে বললেন,—দেখুন না, কাছাকাছি একটা বাড়ি পাওয়া যায় কি না। ক'টা দিন আমরা থাকব।

মালিক ভদ্রলোক, খোঁজার আশ্বাস দিলেন।

সিদ্ধিদাদু ভঙ্গিটা এবার একটু পালটে ফেললেন,—শোনো দাদু, সন্ধের সময় ভূতের বাড়িতে ফিরে শুকনো মুখে সবে বসেছি, সকলেই ভাবছি, আরও একটা কালো রাত্রি আসছে। এমনসময় পিসিমা ঘরে ঢুকলেন। তার এবার অন্যমুখ। হাসি ঝলকাচ্ছে মুখে। আমরা আশ্চর্য। পিসিমা তোপ দাগলেন,—তোমরা কোনও গন্ধ পাচ্ছ না?

শঙ্কুদা, বড়দি, ছোড়দি একসঙ্গে বলে উঠল,—কীসের গন্ধ?...হ্যাঁ, হ্যাঁ, আতপ চাল রান্নার গন্ধ। রাত্তিরে হচ্ছে বুঝি?

পিসিমা বললেন,—ওটাই হচ্ছে ভূতের গন্ধ।

আমরা বললুম,—ভূতের গন্ধ! মানে? তুমি হাসছ কেন? কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না।

পিসিমা আরও হাসতে লাগলেন, ও বললেন,—ভূতকে আমি দেখতে পেয়েছি। ভূত হল গন্ধগোকুল। এ-বাড়িতে আছে। দুটো গন্ধগোকুল রান্নাঘরে ঢুকে আবার কাপ-ডিশ তুলে নিতে যাচ্ছিল। আমি ঢুকতেই জানলা দিয়ে পালিয়েছে। পিছনের জঙ্গলে এখনও রয়েছে। তাই গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

—তাহলে ভূত তোমার বশ মেনেছে! শঙ্কুদা বলে উঠল। ছোড়দি আর আমি খিলখিল করে হেসে উঠলুম।

এই কথা বলার পর সিদ্ধিদাদুর মুখে এখন আবার হাসি ফুটে বের হল। মনে হল ঘটনাটা যেন এইমাত্র ঘটেছে।

—তার পরের ঘটনা বলো। রন্টু উৎসুক হয়ে জিগ্যেস করল।

—সিদ্ধিদাদু উত্তর দিলেন,—আর তো ঘটনা নেই। সকলের আবার দিব্যি ফূর্তির মেজাজ দেখা দিল।

—কিন্তু 'রাম, রাম' লেখা কেন?

সিদ্ধিদাদুর সরস মন্তব্য,—নিশ্চয়ই শঙ্কুদার মতো আগে কেউ বেড়াতে এসেছিল। রহস্যটা টের পাওয়ার পর ফন্দি করে ওই কাজ করেছে। ওই বাড়িতে যারা বেড়াতে যাবে তাদের ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য বাড়ির সব দরজা-জানলায় 'রাম,রাম' লিখে রেখেছিল। আবার অন্য কিছুও হতে পারে। এখন আর অত ভাবার দরকার নেই। অনেক হয়েছে। অনেক আমাকে বকিয়েছ। এবার ঘুমোতে যাও।

—যাচ্ছি। কাল আবার গল্প বলবে তো?

—দেখাচ্ছি মজা!

সিদ্ধিদাদুর হুমকি শুনে রন্টু তাড়াতাড়ি উঠে শোওয়ার ঘরের দিকে চলে গেল।

ছবি সুদীপ্ত মণ্ডল

প্র সি ত রা য় চৌ ধু রী

বাঘ ও বিপ্লবী

সময়কাল ১৯১৮। জায়গাটা আসাম সীমান্ত। ঘন দুর্গম জঙ্গল। সে জঙ্গলে আছে বাঘ, হাতি আর গণ্ডার। কাঁটা-লতায় জড়িয়ে আছে বিষাক্ত সাপ। পথ নেই। ধারালো ছুরিতে কাঁটা-লতা কেটে-কেটে এগিয়ে চলেছেন এক বিশাল দেহী পুরুষ। সঙ্গে চারটি তরুণ। কোমরে পিস্তল। পিছনে ধাওয়া করে আসছে কয়েকজন পুলিশ। ধরা পড়লে ফাঁসির দড়িতে প্রাণ যাবে।

সীমান্ত পেরোলেই তিব্বত। দিনের আলো নিভে আসে। রাত্রি নামে। সহসা রাইফেলের আওয়াজ গুড়ুম, গুড়ুম! ঘিরে ফেলেছে মিলিটারি পুলিশ। বিশাল পুরুষ আর তাঁর সঙ্গীরা পিস্তল তুলে জবাব দিলেন—গুড়ুম, গুড়ুম।

অন্ধকারের মধ্যে সে এক বিচিত্র যুদ্ধ!

বন্দুকের আওয়াজ সহসা থামল। বিশাল পুরুষ মড়ার মতো শুয়ে রইল ঘাস বনের মধ্যে। দেখলেন সঙ্গীরা কেউ বেঁচে নেই। দুজন পুলিশও ঘরে পড়ে আছে।

বিপ্লবী তিনি—সঙ্গীদের জন্য চোখের জল ফেলার সময় নেই। তিন বছর ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেছে। অস্ত্র নিয়ে জার্মান জাহাজ—মেভারিক, আসেনি। সামনাসামনি যুদ্ধে বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন—বাঘাযতীন। বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা "হ্যারি অ্যান্ড সন্স" থেকে হরিকুমার চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা—ডেন হ্যাম।

বিপ্লবীদের আর-এক আস্তানা "শ্রমজীবি সমবায় ভাণ্ডার"-এর মালিক অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের খোঁজে সারাদেশ তোলপাড় করছে। নানা ছদ্মবেশে অমরেন্দ্রনাথ এখন আসামের গভীর জঙ্গলে লুকিয়েছেন। আর বিপ্লবের মহানায়ক—রাসবিহারী বসু তখন জাপানে আত্মগোপন করেছেন। বাঘাযতীনের "ডানহাত" নরেন্দ্র ভট্টাচার্য বাটাভিয়া হয়ে ফিলিপাইনে পলাতক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ ক্লাসের মেধাবীছাত্র অমরেন্দ্রনাথ বাঘাযতীনের দলে যোগ দেন।

টেগার্টসাহেব জানতে পারেন—সশস্ত্র গণ অভ্যুত্থানের নায়ক বাঘাযতীনের পরামর্শদাতা অমরেন্দ্রনাথ। তাঁর সন্ধানেই পুলিশ আসামের জঙ্গলে ধাওয়া করেছে। এই বিশালদেহী পুরুষই, অমরেন্দ্রনাথ।

ঘোর অন্ধকারে কোথায় পথ? শেষে কি বাঘের গ্রাসে প্রাণ যাবে?

সহসা বাঘের গর্জন শুনে অমরেন্দ্রনাথ চেয়ে দেখেন—সামনে দুটো জ্বলন্ত চোখ। মস্ত এক রয়েল বেঙ্গল টাইগার তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে। কই ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড় মটকালো না তো! বরং ঘুরে দাঁড়িয়ে দু-পা এগিয়ে তাঁকে যেন অনুসরণ করতে বললে।

তার মনে পড়ল, স্বামী বিবেকানন্দও একদিন হিমালয়ের জঙ্গলে বাঘের মুখে পড়েছিলেন। বাঘ তাঁকে কিছু বলেনি। তবে কি ভারতের বাঘ ভারতের স্বাধীনতা

সংগ্রামীদের ভালোবাসে? বাঘ এগিয়ে চলেছে ধীরস্থির গতিতে পা ফেলে-ফেলে, মাঝে-মাঝে পিছু ফিরে তাঁকে যেন ডাকছে। অন্ধকারে জ্বলছে তার চোখের টর্চ।

বিপ্লবী অকুতোভয়। বাঘকে অনুসরণ করে চললেন। বাঘ একবার পিছু ফিরে চাইল। কই তার চোখে কুটিল হিংস্র চাউনি? মনে হল, সে যেন বলছে ভয় কী? চলে এসো। বাঘের চোখের ভাষায় বরাভয়।

কিন্তু ওকী! রাতের আঁধারের চেয়ে কালো এক পাহাড় যেন এগিয়ে এল। এবার কী তবে হাতির পাল্লায়? বাঘ ছাড়ল এক ভয়ানক হাঁকার—গিঁয়াও গ্যাঁক! পাহারটা জঙ্গলে ঢুকে গেল।

জঙ্গল গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। সুঁড়ি পথে বাঘ চলেছে। বিপ্লবীও চলেছেন। কাঁটা ফুটছে গায়ে, কাঁটা ফুটছে পায়ে। বাঘ পার হল এ জঙ্গল থেকে সে জঙ্গল। পথের শেষ কোথায়? ক'মাইল হাঁটলেন তার হিসাব নেই। সামনে পড়ল একটা ছোট নদী। বাঘ পেছন ফিরে একবার বিপরীত দিকে তাকাল। তারপর নেমে পড়ল নদীতে। হাঁটতে শুরু করল। অগভীর নদী। বিপ্লবী চললেন বাঘের পিছু-পিছু। নামলেন নদীতে।

পায়ে যেন কীসের ঝাপটা লাগল। মাছ, না কামট! কামট ভয়ানক হিংস্র। ধারালো দাঁতে পা দুটো না কেটে নিয়ে যায়। সাহসী মানুষটাও ভয় পেলেন।

কিন্তু বাঘ ততক্ষণে নদীর পাড়ে উঠে লেজ নাড়ছে। বলছে—এসো, এসো।

মাথার ওপরে বড়-বড় গাছের পাতার ফাঁকে দেখা যাচ্ছে—কালো আকাশে দু-একটা মিটমিটে তারা। জঙ্গলের ভেতর থেকে ভেসে আসছে নানা বিচিত্র শব্দ। বাঘ চলেছে, পেছনে তারই উপাদেয় খাদ্য—মানুষ। বন আর শেষ হয় না। পথেরও বুঝি শেষ নেই। অতি বড় শক্তিমান বিপ্লবীও ক্ষুধায়, ক্লান্তিতে অবসন্ন।

রাত্রি শেষ হয়ে আসে। আকাশে আলোর আভাস। সহসা চোখে পড়ে সামনে উঁচু জমিতে রেলওয়ে লাইন। টেলিগ্রাফের তার লাগানো পোস্ট। বাঘটা লাফ দিয়ে রেলের লাইনে উঠে পড়ল। পিছু ফিরে ডাকল যেন। বিপ্লবী রেললাইনে উঠতেই বাঘ তাঁর দিকে ফিরে চাইল, তারপর মুখ ঘুরিয়ে ডিসটেন্ট সিগন্যালের দিকে বিপ্লবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দেখা গেল, সিগন্যাল ডাউন হয়েছে। সবুজ আলোর কাচটা ঝকমক করছে। এখনই ট্রেন আসবে।

বাঘ সবুজ আলোর দিকে দুবার তাকাল, তারপর চাইল বিপ্লবীর দিকে। সে চাউনিতে হিংসা কই—স্নেহের পরশ। তারপর বাঘটা মারল এক প্রকাণ্ড লাফ। লাইনের ওপাশে ঘন জঙ্গল। তার মধ্যে বাঘটা উধাও হয়ে গেল। যেন বলে গেল—এই পথে পালাও।

সামনেই রেলওয়ে স্টেশন। একটু পরেই ট্রেন এসে গেল। বিপ্লবীও ট্রেনের একটা কামরায় ঢুকে পড়লেন। টিকিট কাটার সময় ছিল না। পকেটে টাকা কোথায়? ট্রেন ছেড়ে দিল। বাঘ তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেল। বিপ্লবীর মনে হল—এ কী বাঘ, না স্বয়ং ভগবান বাঘরূপে এসে তাঁর প্রাণ বাঁচালেন!

তথ্যসূত্র ঃ **বিপ্লবী মহানায়ক এম এন রায়—সুখেন চট্টোপাধ্যায়**

ছবি সুমিত বড়ুয়া

টুকরো খবর

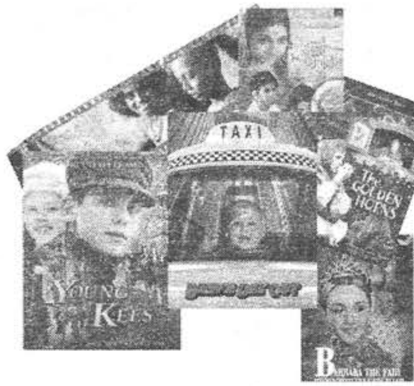

যেন অ্যালিসের সেই আশ্চর্য দেশে। গরমের ছুটিতে। হলিডে হোমওয়ার্ক আর মাসিক পরীক্ষার যাতাকলের বাইরে। মৎসকন্যা এরিয়েল জলের ভিতরের জীবনে যেমন ছিল। সেই নিরানন্দ দৈনন্দিন। তার থেকে ছোটদের মুক্তির আনন্দ। ধন্যবাদ সিনে সেন্ট্রালকে। ৮ম বর্ষের শিশু চলচ্চিত্রের আয়োজন করার জন্য। ধন্যবাদ তাদের সহযোগী নন্দন, ই জেড সি সি, ইউনিসেফ, রিশড়া মিউনিসিপ্যালিটি ও বেলেঘাটা এডুকেশন এড সেন্টার।

উদ্বোধক ছিলেন পরিচালক তরুণ মজুমদার। তার শ্রীমান পৃথ্বিরাজ এই উৎসবে প্রদর্শিত হয়। ছিল আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, শ্রীলঙ্কা, জাপান, চেক প্রজাতন্ত্র, নেদারল্যান্ড প্রভৃতি দেশের ছবি। তবে ভাঁড়ার ঘর থেকে তুলে আনা ভারতীয় চলচ্চিত্র আবার দেখাল, ছোটদের নতুন ছবির অভাব। উৎসব আয়োজিত হয় নন্দন ২, কাঁকুড়গাছির লেবার ওয়েলফেয়ার সেন্টার, রিশড়া রবীন্দ্রভবন ও সল্টলেকের পূর্বশ্রী অডিটোরিয়ামে।

যাই হোক সেই আশ্চর্য দেশে হরেক চরিত্র। হরেক কাণ্ডকারখানা। ছোটরা পিটার প্যানের সঙ্গী। লড়াই হল জলদস্যুদের সঙ্গে। আবার তারা পদি পিসির বর্মী বাক্সের খোঁজে। দ্য প্রিন্সেস অ্যান্ড দ্য পি ছবিতে রাজকুমারের সঙ্গে অ্যাডভেঞ্চার। খোঁজ এক রাজকুমারীর যাকে ভালোবাসা যায়। আবার ফেলুদার সঙ্গে সোনার কেল্লায়। ছবির বইতে দেখা জায়গায় বিঙ্কের সঙ্গে ঘোরা বেবিজ ডে আউটে।

আর যুদ্ধ শুধু জলদস্যু ক্যাপ্টেন হুকের সঙ্গে নয়। দ্যা গোল্ডেন হর্ন-এর বাবা ইয়াগা, যে দুটি মেয়েকে কিডন্যাপ করেছিল। টেল ওব জার সালতান-এর শয়তান মাসি যে ছোট্ট ছেলেটিকে তার মায়ের সঙ্গে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিল। অথবা স্লো কুইন। আর মুকুলের সেই দুষ্টু লোক। লড়াই এদের সবার বিরুদ্ধে। তবে এখানেই সবকিছু শেষ নয়। সকল যুদ্ধের শেষে কাবুলিওয়ালার মিনি দাঁড়িয়ে থাকে সলজ্জ হাসি নিয়ে।

রণিত দাশগুপ্ত

সু র জি ৎ মু খো পা ধ্যা য়

নতুন প্রযুক্তির উভচর যান

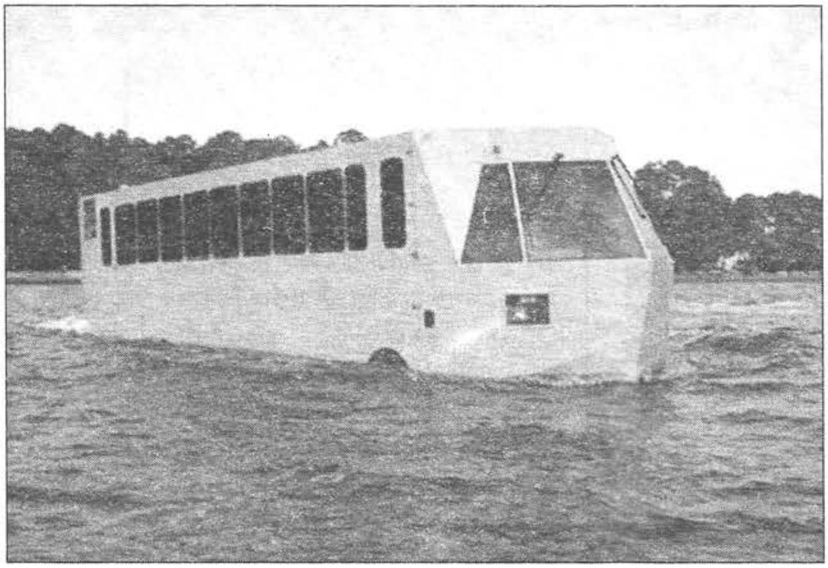

যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয়, উভচর যান কোন কাজে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়? সহজ উত্তর : 'সামরিক কাজে'। তবে বিশ্বের উন্নত কয়েকটি দেশে উপকূল রক্ষা ও উদ্ধার অভিযানেও উভচর যান ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময়েই পৃথিবীর মানুষ সর্বপ্রথম উভচর যানের সফল প্রয়োগ দেখেছিলেন। কিন্তু ইদানিং উভচর যানের প্রয়োগ-ক্ষেত্রের আওতা বেড়েছে। প্রযুক্তির কল্যাণে এক মার্কিন দম্পতি একটি উভচর প্রমোদতরীর উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন। বিলাসবহুল মোটর হোমের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এই দম্পতি তাদের উদ্ভাবনী মেধাকে কাজে লাগিয়ে সম্প্রতি তৈরি করেছেন সম্পূর্ণ কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত উভচর এক প্রমোদতরী। তাঁরা দাবি করেছেন, ''টাইটানিক ডুবে গেছে, ওটা ডুবতেই পারে। কিন্তু আমাদের 'হাইড্রা-টেররা' নামের এই বিলাসবহুল প্রমোদতরী কখনওই ডুববে না।''

যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ক্যারোলিনার কৃতী এই দম্পতির নাম জন গিলজাম এবং জুলি গিলজাম। তাঁরা তাঁদের উদ্ভাবিত ৪৯ আসনবিশিষ্ট উভচর প্রমোদতরীকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। 'হাইড্রা-টেররা' স্থলপথে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৮০ কিলোমিটার গতিতে ছুটতে পারে। আবার জলপথে এটি ঘণ্টায় ৮ নটিক্যাল মাইল গতিতে স্বচ্ছন্দে ভেসে যাওয়ায় এটাকে উপকূল রক্ষা ও উদ্ধার কাজেও সফলভাবে ব্যবহার করা যাবে।

বিশেষজ্ঞরা মানে করছেন, উভচর এই প্রমোদতরী যুদ্ধের পাশাপাশি পর্যটন শিল্পেও বিপ্লব আনবে। অল হুইল ড্রাইভ ও বেলুন টায়ার সংযুক্ত থাকায় এটা সহজেই বালির ওপর দিয়েও চলতে পারে। ৩০০ হর্স পাওয়ার বা অশ্বশক্তির এই উভচর যানটিতে ক্যাটারপিলার ডিজেল ইঞ্জিন, অ্যালিসন অটোমেটিক ট্রান্সমিশন ও প্রচলিত অ্যাক্সেল সংযুক্ত করা হয়েছে। পেছনে দুটো ব্রোঞ্জ প্রপেলার ছাড়া উভচর যানটিকে দেখতে একটা বিলাসবহুল বাসের মতো। জলে নামার পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে এর বাহ্যিক আকারে পরিবর্তন আনা যায়।

৩৪ ফুট চওড়া, এবং সাড়ে ৪২ ফুট লম্বা এই প্রমোদতরীতে কী নেই! ফ্রিজ থেকে শুরু করে ওয়াশার, ড্রায়ারা, বার্নার, ইলেকট্রিক কুকার, ডিশওয়াশার, মাইক্রোওয়েভ, কনভেকশন ওভেনসহ আরাম-আয়েশের যাবতীয় ব্যবস্থা এতে রয়েছে। অপরদিকে যানটিতে অত্যাধুনিক সিস্টেম ব্রেকার্স, ওয়ানটাচ লেভেলিং, মেরিন শিফটার, রাডার কন্ট্রোল, হিটিং, জেনারেটর, ইঞ্জিন মনিটর (ল্যান্ড ও সি), বিলজ পাম্প, রিমোট কন্ট্রোল, ফ্লাড লাইট, লেদার প্যাডেড ড্যাশ, অটোফায়ার সাপ্রেশন সিস্টেম, ওয়াটার অ্যালার্ম, এয়ারকন্ডিশন এবং সর্বোপরি ইনটেরিয়র ডেকরেশন সাউন্ড প্রুফ হওয়ার কারণে বিনোদন রাজ্যে এটা বিপ্লব বয়ে আনতে পারে। শোনা যাচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যের শেখরা মোটামুটি ১২ লক্ষ ডলার মূল্যের এই ধরনের উভচর যান কেনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

ইউনাইটেড স্টেট কোস্ট গার্ড ও আমেরিকান ব্যুরো অব শিপিং এই যানটিকে অনুমোদন দিয়েছে। হাইড্রা-টেররার প্রযুক্তি খুব উন্নতমানের। ফাইবার গ্লাসের পরিবর্তে এটির খোলস রিইনফোর্সড অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি। আর এটা তো সবাই জানে যে ফাইবার গ্লাসের চেয়ে বেশ কয়েকগুণ বেশি উন্নত হল অ্যালুমিনিয়াম। দ্বিতীয়ত এটির খোলসের ফাঁকে-ফাঁকে জল প্রতিরোধক ফোম রয়েছে। ফলে ড্রেন-প্লাগ খুলে ফেললেও যানটির জলে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা থাকছে না। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এর ফোম ফ্লোটেশন সিস্টেম অত্যন্ত উন্নতমানের এবং পরীক্ষিত। পরীক্ষায় এটাও প্রমাণিত, হাইড্রা-টেররার তলদেশে ২ বর্গফুট মাপের গর্ত থাকলেও তা একবিন্দু পরিমাণ ডোবে না। আবার এটাও প্রমাণিত হয়েছে, জলে ঢেউয়ের উচ্চতা ৬ ফুটের বেশি হলেও যানটি বিপদে পড়ে না।

স্বপন বক্সী

মুর্শিদাবাদের পথে পথে

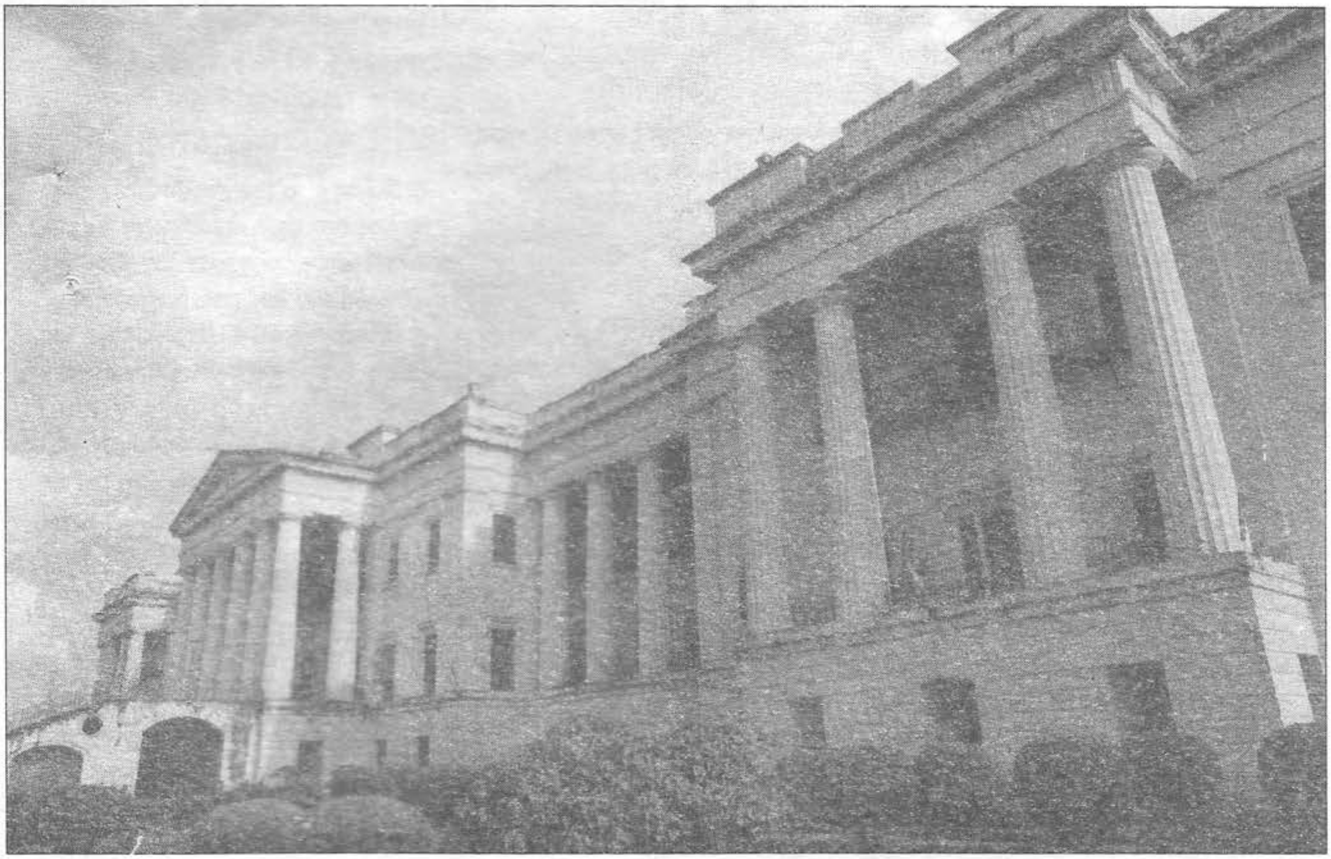

ইতিহাসটা নাড়াচড়া করলে জানা যায় যে, হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ হিসাবে মুর্শিদাবাদের পরিচয় ছিল। পরবর্তীকালে মুর্শিদকুলি খাঁ যখন বাংলার নবাব হন তখন এই জায়গার নাম হয় মুর্শিদাবাদ।

আজও সারা পৃথিবীর কাছে মুর্শিদাবাদ নবাব আমলের আদবকায়দা আর ঐতিহ্যের নিদর্শন হয়ে আছে।

হাজারদুয়ারি

১৮২৯ থেকে ১৮৩৮ সাল এই সুদীর্ঘ সময় ধরে ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইতালিয় স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত হয় হাজারদুয়ারি। উচ্চতায় এটি ৮০ ফুট। ত্রিতল বিশিষ্ট এই প্রাসাদের আয়তন আনুমানিক ৪২৫×৪০০ ফুট। ৮টি গ্যালারি নিয়ে মোট ১১৪ টি ঘর। আসল দরজা ৯০০টি, ১০০টি কৃত্রিম দরজা। গথিক শৈলীর এই প্রাসাদের একতলায় আছে অস্ত্রাগার, মহাফেজখানা ও তোশাখানা। দোতলায় আছে দরবার কক্ষ, ডাইনিং হল। ড্রয়িং রুম, বিনোদন কক্ষ এবং তিনতলায় আছে নাচঘর, গ্রন্থাগার ও শয়নকক্ষ। দোতলায় দরবার কক্ষে রূপোর সিংহাসন যা বাংলার মসনদ নামে খ্যাত। সেখানে বসে তখনকার নবাব রাজত্ব চালাতেন। এক অভিনব আয়না আছে এই প্রাসাদের মন্ত্রণাকক্ষে। নিজেকে দেখা যায় না, বাকি সব দেখা যায়। ৪১ একর জায়গা জুড়ে হাজারদুয়ারি। দরবার হল পর্যন্ত বিস্তৃত উঁচু সিঁড়ি উঠে গেছে। আর্ট গ্যালারিতে রয়েছে অসাধারণ মূল্যবান ও দুর্লভ সব ছবি। গ্রন্থাগারে মূল্যবান দলিল-দস্তাবেজ, তাম্রলিপি, পাণ্ডুলিপি, চুক্তিপত্র, বাগদাদ-সম্রাট আল-রশিদের হাতে লেখা কোরান, আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরির পাণ্ডুলিপি রয়েছে। আছে ব্রিটেনের মহারানির উপহার দেওয়া শতাধিক লণ্ঠনযুক্ত ঝাড়বাতি, নানা পাথরের মূর্তি, ফুলদানি, অভিনব চাইনিজ প্লেট। খাবারের বিষ থাকলে যে প্লেট ফেটে যাওয়ার কথা।

অস্ত্রাগারে পলাশি যুদ্ধে ব্যবহৃত সমস্ত

অস্ত্র বাদে সিরাজের তলোয়ার, বহু নলওয়ালা বন্দুক, আলিবর্দির তলোয়ার, মীর কাশিমের ছোরা এবং মহম্মদি বেগের ছুরি যা দিয়ে সিরাজকে হত্যা করা হয়, সেগুলিও রয়েছে। হাজারদুয়ারির পেছন দিকের বাগানটিও মনোরম।

হাজারদুয়ারি থেকে সূর্যাস্ত মনোসুগন্ধকর।

হাজারদুয়ারির সামনের মাঠে পাশাপাশি রয়েছে ঘড়িঘর, মদিনা, বাচ্চাওয়ালি তোপ।

ঘড়িঘর

একটি সুউচ্চ মিনার। এই মিনারে লাগানো আছে ঘড়ি। নবাব হুমায়ুনজা বা হুমায়ুন খাঁ এটি বানিয়েছিলেন হাজারদুয়ারির প্রাসাদ নির্মাণের সময়।

মদিনা

এটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট। সিরাজের মায়ের ইচ্ছাপূরণের জন্যে খাঁ-ই এটি বানিয়েছিলেন হাজারদুয়ারি প্রাসাদ নির্মাণের সময়।

বাচ্চওয়ালি তোপ

এক বিশাল কামান। একবার এই কামান দাগতে গেলে ১৮ সের বারুদ লাগত এবং ১৬ কিমি পর্যন্ত তা ছড়িয়ে যেত। এর বিকট শব্দে অনেক শিশু মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসত। সেই থেকে এর নাম হয় বাচ্চাওয়ালি তোপ এবং এসব ঘটনার পর থেকে তোপ দাগাও নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

ইমামবাড়া

হাজারদুয়ারির উত্তরদিকে ভারতের বিশালতম ইমামবাড়া ক্রমশ ভাঙছে। সিরাজ-নির্মিত কাঠের ইমামবাড়াটি ১৮৪৬-এ ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ার পর ১৮৪৭ সালে প্রায় লাখ টাকা ব্যয়ে এটি নির্মাণ করা হয়। মাঝের মেদিনা অংশটি রঙিন চিনা ও হল্যান্ড থেকে আনা টালিতে অলংকৃত। মূল্যবান জিনিসের একটি মিউজিয়াম এখানে আছে।

ওয়াসেফ মঞ্জিল—নিউ প্যালেস

হাজারদুয়ারির দক্ষিণ দিকে গঙ্গার তীরে এই পশ্চিমমুখী প্রাসাদটি। টাঙা নিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে টিপুলিয়া গেট। গেট পেরোবার আগেই পড়বে চক মসজিদ। কাছেই চক বাজার। এখানেই মুর্শিদকুলি খাঁ-র দরবার গৃহ 'চেহেল সেতুন' ছিল। মীরজাফরের স্ত্রী মণিবেগম বীণাবাদক ওয়াজেদ আলিকে এটি দান করেছিলেন।

তোপখানা

মুর্শিদাবাদ রেল স্টেশনের কাছেই তোপখানা। মুর্শিদকুলি খাঁ-র অস্ত্রাগার ছিল এখানে। বর্তমানে এখানে আছে অষ্টধাতুর জাহানকোষা কামান, যাতে এখনও মরচে পড়েনি।

কদমশরিফ

বসন্ত আলি খাঁ-র সমাধিস্থল।

কাটরা মসজিদ

এর নির্মাণশৈলীতে মক্কার কাবা-র অনুকরণ পরিলক্ষিত হয়। মসজিদের দু-দিকে দুটি উঁচু মিনার। উচ্চতা ৭০ ফুট। মিনার দুটি দর্শকদের বিস্মিত করে। মিনারের ওপর থেকে মুর্শিদাবাদের অনেকটা অঞ্চলই দেখা যায়।

মসজিদের ভেতরে দেওয়ালে কোরান পাঠের জন্য অনেক প্রকোষ্ঠ আছে। কড়ি বরগাবিহীন এই মসজিদের নির্মাণ কৌশলে অভিনবত্ব আছে। ৭০০ কোরান পাঠক বাস করতেন অতীতে। ২০০০ লোক একসঙ্গে কোরান পাঠ করতে পারতেন। এর পরেই ফুটি মসজিদ, রাধামাধব মন্দির, জগৎ শেঠের বাড়ি, নসীপুর রাজবাড়ি, নিমক হারাম দেউড়ি দেখে নেওয়া যায়।

ভাগীরথীর অপর পারে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি হল খোসবাগ, রোশনাই বাগ, ডাহাপাড়া, হীরাঝিল, কিরীটেশ্বরী মন্দির।

হীরাঝিল

সিরাজ নবাব হওয়ার আগেই হীরাঝিল প্রাসাদের জন্য পাথর আনান গৌড় থেকে। প্রাসাদের পাশে দামি পাথর বাঁধানো বিশাল ঝিল, চারপাশে বিদেশি গাছ। আজ কিছুই অবশিষ্ট নেই।

ডাহাপাড়া ধাম

রোশনাই বাগের থেকে কিছু দূরে প্রভু জগবন্ধুর জন্মভিটেতে গড়ে উঠেছে আশ্রম। থাকার ব্যবস্থাও আছে এখানে।

মোতিঝিল

মোতিঝিল ৭৫০ বিঘার অশ্বক্ষুরাকৃতি একটি হ্রদ। বর্তমানে কচুরি পানায় ভরতি। একসময় এখানে মোতি বা মুক্তোর চাষ হত। তাই এই হ্রদের নাম ছিল মোতিঝিল। মোতিঝিল ও সংলগ্ন অঞ্চলটির মোট আয়তন প্রায় ১০০০ বিঘা। একটি অপূর্ব সুন্দর প্রাসাদ আছে, সেখানে ঘসেটি বেগম থাকতেন। সেই প্রাসাদ 'সাংহী দালান' এখন ধ্বংসস্তূপ। পাশেই আছে ঘসেটি বেগমের গুপ্তঘর। এই গুপ্তঘরকে ঘিরে নানা কাহিনির প্রচলন আছে। দরজা-জানলাবিহীন এই ঘরটি সত্যিই বিস্ময়কর সৌধ। ৭৫০ বিঘের এই ঝিলের নৈসর্গিক সৌন্দর্য অসাধারণ। নৌকাবিহার বা জলক্রীড়াই শুধু নয়, পিকনিক স্পট বা পার্ক হিসেবেও সংলগ্ন জায়গাটি ব্যবহৃত হয়। মোতিঝিল বহরমপুরে এবং মুর্শিদাবাদের মাঝে পড়ে। মাত্র ৩৩ বিঘা জমিতে কত সুন্দরভাবে ব্যবহার করে আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র করা যায় তার নিদর্শন মোতিঝিল পার্ক। প্রকৃতির মাঝে একটা দিন কী করে উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে তার সবই হাজির এই পার্কে। ট্রয়ট্রেনে চড়া, বোটিং করা যায়। ঝিলের মাঝখানে আইল্যান্ডে রিসর্ট। ছোট মিউজিয়ামও তৈরি হয়েছে সিরাজদ্দৌলার নামে। লালবাগের ঘাট পেরিয়ে খোসবাগ, আলিবর্দি, সিরাজ, লুৎফার সমাধি আছে।

যাতায়াত ঃ হাওড়া বা শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে উঠে নামতে হবে বহরমপুরে। বহরমপুর কোর্ট স্টেশন থেকে তিন-চার কিলোমিটার রাস্তা মুর্শিদাবাদ। এছাড়া ঘণ্টায়-ঘণ্টায় সরকারি ও বেসরকারি বাস যাচ্ছে বহরমপুর।

থাকার ব্যবস্থা ঃ বহরমপুরে অনেক ছোটবড় হোটেল ও লজ আছে—**হোটেল ভাগীরথী, হোটেল হোয়াইট, হোটেল ময়ূর, হোটেল সম্রাট, মর্ডান আইডিয়াল লজ** প্রভৃতি। হাজারদুয়ারিতে আছে **হোটেল মঞ্জুষা, হোটেল অনুরাগ, হোটেল যাত্রিক, হোটেল ওমরাও** প্রভৃতি।

কোথায় কী আশ্চর্য

বরফের চার্চ

রুমানিয়ায় একটি চার্চ আছে যা শুধু মাত্র বরফ দিয়েই তৈরি। চার্চে ইদানিং খুব ভিড় হচ্ছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন—না, মোমবাতি নিয়ে ঢোকা চলবে না। বরফ গলে যাবে। এদিকে কার্পাথিয়ান পর্বতের এই চার্চে প্রচুর আবেদনপত্র জমা পড়ছে। সকলেই চাইছেন সেখানে নিজেদের অনুষ্ঠানগুলি করতে। বরফের গির্জা—ব্যাপারটা অভিনব হয় না কি যদি সেখানে বিবাহ অনুষ্ঠান হয়? গির্জায় সর্বদা মোমবাতি জ্বলত—এতদিন। এবার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। গির্জাটি ২০০ ফুট উঁচু—বালিয়া লেকের কাছে এই গির্জাটি সমুদ্রস্তর থেকে ৬,৬৭৩ ফুট ওপরে। যিনি চার্চটি তৈরি করেছেন—তার ইচ্ছে সেখানে একটি বরফের হোটেলও নির্মাণ করবেন।

টিকটিকি

ভদ্রলোক ছিলেন পুলিশে। ন্যায় বিচারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে চাকরি ছেড়ে দিলেন। আর যে পারছেন না বিশ্বাস ধরে রাখতে। কিন্তু মন যে অনুসন্ধানী—কাজ করতে চায়। মাথায় এল নতুন আইডিয়া।

বাড়ির পোষা বিড়ালটা হারিয়ে গেছে—গরুটা মাঠ থেকে ফেরেনি—চুরি হয়েছে প্রিয় কুকুরটি—তাহলে তাকে ডাকা যায়। ভদ্রলোক খুঁজে বার করার দায়িত্ব নিতে পারেন। টম ওয়াটকিংস-এর এই নতুন কাজে রোজগারপাতিও ভালো হচ্ছে। টম পশুপাখির স্বভাব, রুচি, বুদ্ধি নিয়ে পড়াশুনাও করছেন—যাতে তার কাজ অনেকটা সহজ হয়।

অভিনয়

সেনা বিভাগে ভদ্রমহিলা দু-বছর কাটিয়ে দিলেন—স্রেফ অভিনয়ের জোরে। মেজরের ভূমিকায় অভিনয় চলছিল দারুণ। চায়নার সিচুয়ান প্রদেশের অ্যানজিয়ান টাউনের ঘটনা। এই মহিলা লি ঝানউ নাম ভাড়িয়ে কাজ চালাতেন—এমনকি চোরা পথে অর্থ উপার্জন পর্যন্ত। পুলিশের নজর পড়ল তার অনেক পরে—ডাটং সিটির লিউ লিয়ান পুলিশকে জানালেন এক মেজর তাকে চিট করেছেন। এগারো হাজার পাউন্ড নিয়ে কেটে পড়েছেন। এর সঙ্গে তার নেটের মাধ্যমে পরিচয় হয়। ওই অর্থ তিনি দিয়েছিলেন তার মেয়ের চাকরির জন্য। টাকা নিয়ে মেজর সাহিবা সেই যে হাওয়া হয়েছিলেন তারপর আর দেখা দেননি। পরে পুলিশ তাকে ধরে ফেলল—জানা গেল তিনি মেজর, তবে পুরুষ নন—মহিলা।

সতেরো

নিজের বাড়ির নীচে মাটি খুঁড়ে সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করে ছিল সে। আর তাতেই কাটিয়ে দিয়েছে সতেরো বছর। পুলিশ ধরতে পারেনি তাকে। সে ছিল এক দাগী আসামি—পুলিশের কাছে ওয়ার্ল্ড ক্রিমিনাল। চায়নার ঘটনা। ঝানড়ু গ্রামের সুইনান টাউনে এই বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটেছে। হুই গুয়ানওয়েংকে পুলিশ শেষপর্যন্ত খুঁজে বার করেছিল ঠিকই কিন্তু অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে। পুলিশের কাছে দীর্ঘদিন ধরে খবর ছিল এই বাড়িতে আছে। কিন্তু সার্চ করে তাকে পাওয়া যেত না। ওদিকে পুলিশ মাঝেমধ্যেই আচমকা হানা দিত তার বাড়িতে। হুই ও তার স্ত্রী দুজনে মিলে অজ্ঞাতবাসের জন্য ওই সুরঙ্গ বানিয়ে ছিল। আর ওই সতেরো বছর হুই তার বাইরে যায়নি। এখন স্বামী-স্ত্রী দুজনেই শ্রীঘরে।

ম্যাকাও

নিরাপত্তার জন্য ওয়াচডগ রাখা হয়—সে খুব নতুন কিছু নয়। কিন্তু ওয়াচবার্ড? পাখি যখন নিরাপত্তা রক্ষী! একটু কেমন শোনাচ্ছে তাই না? কিন্তু সাত বছরের মার্লিন, ম্যাকাও পাখি, রীতিমতো বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। মার্লিন-এর গায়ের রং সোনালি তার ওপর নীল রং-এর টান—মার্লিন এমন ভাবে পাহারা দেয় যে ত্রিসীমানায় চোর ছ্যাঁচড় আসতে পারে না। মাসাচুসেট্স্-এ গেলে মার্লিনের দেখা মিলতে পারে। পশুপাখিদের জন্য সেখানে একটা শান্তির নীড় আছে। কাচের জানালা ভেঙে একদিন কয়েকজন সেখানে ঢুকতে চেষ্টা করল—আর যায় কোথায় মার্লিন এমন চিৎকার করতে শুরু করল যে তারা পালাতে পথ পায় না। এই ম্যাকাও পাখি খুব ধুরন্ধর আর মানুষের গলা অদ্ভুতভাবে নকল করতে পারে।

কল্যাণ মৈত্র

ক'দিন ধরে শহরে কী বৃষ্টি,
ঘরবাড়ি সব নদী হয়ে বড় অনাসৃষ্টি!
ওদিকে ত্রাণ আপিসে আসছে প্রচুর ফোন,
এমনসময় বড়বাবুর মোবাইলে বাজে রিং টোন!
ফোন ধরেই বড়বাবু বলেন, কী চান?
উত্তর আসে, দু-ফুট জলে দাঁড়িয়ে আমি
বাঁচান!
মিসটেক!!
তৌসিফ হক
চটে গিয়ে বড়বাবু বলেন, ওরে শোন,
তোর চেয়ে বেশি জলে ডুবে আছে কতজন!
কিন্তু আমি বড়বাবু, বলছি কী সাধে...
দাঁড়িয়ে আমি চারতলার ছাদে!
EXIT

রা তু ল ঘো ষ

সব ম্যাচ জিতে স্পেন ইউরো চ্যাম্পিয়ন

প্রায় তিন সপ্তাহব্যাপী ইউরো ফুটবলের ওপর ২৯ জুন যবনিকা পড়ল। ৪৪ বছর বাদে ইউরো খেতাব জিতল স্পেন। ফাইনালে জার্মানিকে ১-০ গোলে হারিয়ে ইউরোপ সেরা-র শিরোপা দখল করল লুই আরাগোনেসের দল। ৬৯ বছর বয়সি এই প্রবীণ প্রশিক্ষক দীর্ঘ পাঁচ বছর স্পেনের জাতীয় দলের দায়িত্বে ছিলেন। এটাই তাঁর বড় মাপের টুর্নামেন্টে একমাত্র উল্লেখযোগ্য সাফল্য। রবিবার রাতে ভিয়েনার আর্নেস্ট হ্যাপেল স্টেডিয়ামে ফার্নান্দো তোরেসের ৩৩ মিনিটের গোলে স্পেন ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দেয়। সত্যি কথা বলতে কী, ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে সবক'টি ম্যাচ জিতে খেতাব জয়ের নজির এর আগে মাত্র একবারই রয়েছে। ১৯৮৪ সালে প্যারিসের পার্ক দ্য প্রিন্সেস স্টেডিয়ামে মিঁশেল প্লাতিনির ফ্রান্স শুরু থেকে শেষ অবধি অপরাজিত থেকে এই খেতাব জিতেছিল। প্লাতিনি সেবার একাই ৯টি গোল করে টুনামেন্টের অবিসংবাদিত নায়ক হয়েছিলেন। সেবার ফ্রান্স ফাইনালে হারিয়েছিল স্পেনকে।

সদ্য সমাপ্ত ইউরো-র গোটা টুর্নামেন্টের দিকে যদি একঝলক তাকানো যায়, তাহলে স্পষ্ট বোঝা যাবে, যোগ্য দল হিসেবেই স্পেন এই খেতাব জিতেছে। গ্রুপ লিগের প্রথম ম্যাচে ৪-১ গোলে স্পেন চুর্ণ করেছিল এই প্রতিযোগিতার ডার্ক হর্স রাশিয়াকে। ওই ম্যাচে ডেভিড ভিলা হ্যাটট্রিক করেছিলেন। ফাইনালে অবশ্য চোটের জন্য খেলতে পারেননি ফর্মে থাকা এই স্প্যানিশ স্ট্রাইকারটি। তার বদলে গোটা টুর্নামেন্টে যিনি পরিবর্ত হিসেবে স্পেনের লাল-হলুদ জার্সি গায়ে নিয়মিত খেলছিলেন আর্সেনালের সেই কুড়ি বছরের গেম মেকার ফ্যাব্রেগাস ফাইনালে প্রথম একাদশে ঢুকে ম্যাচের ৩৩ মিনিটে তোরেসকে গোলের পাসটি বাড়ান। ফাইনালে স্পেন অবশ্য জার্মানিকে গোলের মালা পরাতে পারত।

মাঝমাঠে স্পেনের দাপট এতই ছিল যে মিডল থার্ড থেকে অ্যাটাকিং থার্ড অবধি ফাইনালে অধিকাংশ সময়ই দাপিয়ে বেড়িয়েছে তোরেস, ইনিয়েস্তা, সেন্না, জ্যাভি, ডেভিড সিলভারা। জার্মানির গোলরক্ষক লিম্যান কয়েকটি অব্যর্থ সেভ করেছেন। এছাড়া তোরেসের হেড পোস্টের নীচে লেগে ফিরে এসেছে। সেন্না, তোরেস, জ্যাভিরা অনেকগুলি সহজ সুযোগ নষ্ট করেছেন। তবে ম্যাচের শুরুটা দেখে বোঝা যায়নি, ফাইনালে জার্মানির এমন করুণ দুর্দশা হবে। শেষ দিকে জার্মানরা রীতিমতো বেদম হয়ে যায়।

এই টুর্নামেন্টে দেখা গেল, যে দলের মাঝমাঠের বৈচিত্র্য বেশি তারাই ম্যাচ বের করে নিয়েছে। সবচেয়ে সফল ফর্মেশন হিসেবে এবারের ইউরোয় ৪-৫-১ ছকের জয়যাত্রা অব্যাহত রইল। আর্সেনালের ফরাসি কোচ আর্সেন ওয়েঙ্গার মনে করেন, এটাই এই মুহূর্তে আধুনিক ফুটবলের সেরা ফর্মেশন। সিঙ্গল স্ট্রাইকারকে আপ ফ্রন্টে রেখে মাঝমাঠে পাঁচ মিডিও বিপক্ষের উইংকে ক্রমাগত স্ট্রেচ করে আক্রমণ শানিয়ে যায়। ফাইনালে স্পেন এই ছকেই খেলে সাফল্য পেয়েছে। যদি ডেভিড ভিলা সুস্থ থাকতেন তবে হয়তো স্প্যানিশ কোচ ডবল স্ট্রাইকারে খেলতেন। সেক্ষেত্রে, সুপার সাব রূপেই পরে নামতেন ফ্যাব্রেগাস।

ফার্নান্দো তোরেস

টুর্নামেন্টের শুরুতেই চমক দিয়েছিল বাস্তেনের হল্যান্ড দলের টোটাল ফুটবল। গ্রুপ লিগে টানা দুটি ম্যাচে হল্যান্ড চুরমার করে দিয়েছিল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইতালি ও রানার্স ফ্রান্সকে। ওই দুটি ম্যাচে ডাচরা সাত গোল দিয়েছিল। তখন মনে হয়েছিল, এই হল্যান্ডকে বোধহয় কেউ থামাতে পারবে না। একই ভাবে গতবারের রানার্স আপ পর্তুগালও স্কোলারির প্রশিক্ষণে দারুণ ভাবে শুরু করেছিল। কিন্তু হল্যান্ড ও পর্তুগাল সম্ভবত আগেই পিক ফর্মে পৌঁছে যায়। আসল সময়ে তারা জ্বলে উঠতে ব্যর্থ হয়।

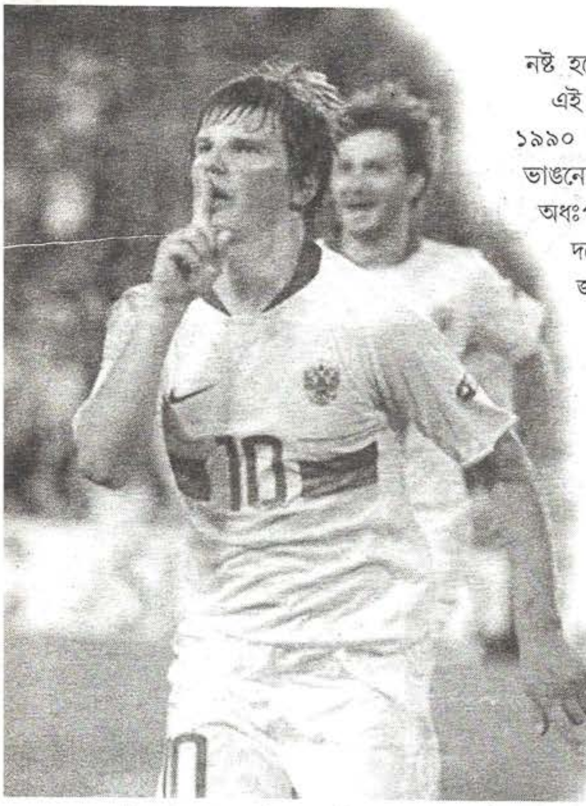

ইউরোয় সেরা আবিষ্কার রাশিয়ার আন্দ্রে আর্শাভিন

পর্তুগালের মেগাস্টার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর দিকে এই টুর্নামেন্টের গোটা দুনিয়ার আকর্ষণ কেন্দ্রীভূত ছিল। এবারের ইউরোয় তিনিই সবচেয়ে জনপ্রিয় ফুটবলার ছিলেন।

পর্তুগালের কোচ স্কোলারি প্রতিযোগিতা শুরুর আগে সব ফুটবলারকে টিম মিটিং-এ বলেছিলেন, 'তোমরা কেউ ইউরো চলাকালীন দল বদলের ভাবনাকে প্রশ্রয় দিয়ো না। পুরো ফোকাস সংহত করো এই টুর্নামেন্টের দিকে। কোনও এজেন্ট দল বদলের লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে এলে তাকে ভাগিয়ে দেবে। সব কথাবার্তা হবে ইউরোর পরে।'

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, ইউরো চলাকালীন পর্তুগালের কোচ স্কোলারি চেলসির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। তখন থেকেই ফুটবলাররা তাঁকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করেন। তারা প্রশ্ন করেন, এই ডাবল স্ট্যান্ডার্ডের মানে কী? কোচ মুখে এক কথা বলছেন, করছেন আর-এক কাজ। এতে তো টিম স্পিরিটই নষ্ট হবে। পর্তুগাল দলের পক্ষে ঠিক তাই ঘটেছিল। জার্মানি তাদের হারিয়ে বুঝিয়ে দেয়, কোনও দলের ফোকাস নষ্ট হলে সেই দল সাফল্য পায় না। এই টুর্নামেন্টের আবিষ্কার রাশিয়া। ১৯৯০ সালের সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর থেকে রাশিয়ান ফুটবল অধঃপতিত হয়। সাবেক সোভিয়েত দলে বেশি দাপট ছিল ইউক্রেন, জর্জিয়া, উজবেক ফুটবলারদের। রাশিয়ানরা তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় কম ছিলেন। এবারের ইউরোর বাছাই পর্বে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে রাশিয়া প্রথম চমক সৃষ্টি করে। বাছাই পর্বে ওই ম্যাচটা জিতলে ইংল্যান্ড ইউরোর মূল পর্বে উঠে আসত। কিন্তু গাস হিডিঙ্কের রাশিয়া ওই ম্যাচে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে গোটা প্রতিযোগিতার ওপর বিশাল ছাপ ফেলে। এবারের ইউরোয় বিভিন্ন দলে খেলেছেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ৪৪ জন ফুটবলার। অথচ খোদ ইংল্যান্ড মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। রাশিয়া প্রথম ম্যাচে স্পেনের কাছে ১-৪ গোলে হেরে গিয়ে এতটুকুও হতোদ্যম হয়নি। পরবর্তী তিনটি ম্যাচে তারা অ্যাটাকিং ফুটবল খেলেছে। রাশিয়ার এই ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই-এ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন আন্দ্রে আর্শাভিন ও পাভলুচেঙ্কো। সুইডেনের গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে প্রথম রাশিয়ান জার্সি গায়ে খেলতে নামেন আর্শাভিন। আর্বিভাবেই তিনি নায়ক বনে যান। সুইডেনকে হেলায় হারিয়ে রাশিয়া কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে আসে। তার আগে রাশিয়া হারিয়ে ছিল গতবারের চ্যাম্পিয়ন গ্রিসকে। কোয়ার্টার ফাইনালে হল্যান্ডের বিরুদ্ধে পিক ফর্মে পৌঁছে যায় রাশিয়া। সকলেই ধরে নিয়েছিল হল্যান্ড সহজেই হারিয়ে দেবে রাশিয়াকে। কিন্তু ম্যাচের ফল হল উলটো। হল্যান্ডের বিখ্যাত টোটাল ফুটবল রাশিয়ান ফুটবলারদের তারুণ্য ও তেজের কাছে হার মানে। আবার এই রাশিয়ান দলটাকেই দাঁড় করিয়ে সেমি ফাইনালে হারায় স্পেন।

ইউরোপিয়ান ফুটবলের তিন সুপার পাওয়ার ফ্রান্স, ইতালি ও জার্মানির মধ্যে একমাত্র শেষোক্ত দলটি ফাইনালে উঠে এই টুর্নামেন্টে কিঞ্চিৎ দাগ কাটতে পেরেছে। ফ্রান্স এখনও জিদানের বিশাল ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। মালুদা ও রিবেরি ছাড়া আর কোনও ফরাসি ফুটবলার দর্শকদের মনে প্রভাব ফেলতে পারেননি। থিয়েরি অঁরি ফ্রান্সের জার্সি গায়ে বরাবরই ব্যর্থ। ক্লাব লেভেলে অঁরি সফল।

ফ্রান্সকে আমি ২০০২ সালে জাপান-কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিতে দেখেছিলাম। এবারও তারা ইউরোর প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছে। গ্রুপের শেষ ম্যাচে ফ্রান্সকে হারিয়ে ইতালি কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেও 'আজ্জুরি' এবার ইউরোয় আদৌ জ্বলে ওঠেনি। লুকা টোনির মতো এক গোলকানা স্ট্রাইকারকে খেলিয়ে ইতালি ডুবেছে। এই টুর্নামেন্টের আর যে দলটি ভালো খেলেছে তারা হল তুরস্ক। তাঁরা তিনটি ম্যাচে পিছিয়ে পড়ে জিতেছে। ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে তুরস্কের জয় আগামী দিনে বহু মাঝারি মাপের ফুটবল দলকে প্রেরণা দেবে।

এবারের ইউরোয় সেরা আবিষ্কার রাশিয়ার আর্শাভিন। সবচেয়ে জনপ্রিয় ফুটবলার রোনাল্ডো। সেরা গোল অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রি কিক থেকে বালাকের করা। সেরা দল অবশ্যই সব ম্যাচে জিতে চ্যাম্পিয়ন স্পেন। প্রতিযোগিতার সবচেয়ে প্রভাবশালী ও গতিময় স্ট্রাইকার স্পেনের তোরেস। সেরা মিডফিল্ডার হল্যান্ডের স্নেইডার। সবচেয়ে সম্ভাবনাময় দল হিডিঙ্কের রাশিয়া। আর সবচেয়ে সুপারফ্লপ দল গতবারের চ্যাম্পিয়ন গ্রিস।

এবার ক্রিকেটের প্রসঙ্গে আসা যাক। ভারতীয় দল ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টের ফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্রী খেলে ১৪০ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরেছিল। এই কপি লেখার সময় করাচিতে এশিয়া কাপের খেলা চলছে। সেওয়াগ, গম্ভীররা ব্যাটে রান পাচ্ছেন। হংকং, পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে প্রথম তিনটি ম্যাচে অনায়াসে হারিয়ে ধোনির নেতৃত্বে ভারতীয় দল এই টুর্নামেন্ট সাড়া জাগিয়ে শুরু করেছে। দেখা যাক, ভারত শেষ অবধি এশিয়া কাপ জিততে পারে কি না।

নিজেদের মধ্যে জমিয়ে তর্ক করতে চাও? যার যা খুশি লিখে পাঠিয়ে দাও!...

চাই! চাই না!

সৌরভ কি ২০-বিশ ক্রিকেটের উপযুক্ত?

সৌরভ তো আর ফুটবল খেলে না যে ২০-বিশ ক্রিকেট খেলতে পারবে না। সৌরভ আসলে ক্রিকেটই খেলে। তাই এই ২০-বিশ খেলাও তার উপযুক্ত। টেস্ট, ৫০ ওভার খেলেছে, এই খেলাই বা খেলতে পারবে না কেন? হ্যাঁ, এই খেলা একটু অন্য রকম, ২০ ওভারের খেলা, ফলে মাঠে নেমেই ব্যাট চালাও ফলে আউট হওয়ার চান্স বেশি। সৌরভ ২০-বিশ খেলায় ভালো ফল না করায় উপযুক্ত কি না এ প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রসঙ্গে বলি একটা লরির ড্রাইভার যদি বাস চালাতে গিয়ে এক আধবার স্টার্ড অফ হয়ে যায় তাহলে কি তাকে বাসের ড্রাইভারের উপযুক্ত নয় বলে ঘোষণা করব? কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে ক্যাপটেনশিপ করেছে। অন্য খেলোয়াড়রা ভালো না খেলায় ফাইনালে উঠতে পারেনি সৌরভ বা নাইট রাইডার্স দল। কিন্তু ফাইনালের কাছাকাছি লড়ে তো গেছে। এটাই বড় প্রমাণ ২০-বিশ ক্রিকেটে সৌরভের উপযুক্ততার।

সুরজিৎ শীল হুগলি-৭১২৪০৮

২০-বিশ ক্রিকেটে এমনই সেখানে ক্লাস দিয়ে খুব কম রান হয়। রান করতে প্রয়োজন শুধু ব্যাটের জোর। বল নষ্ট করা এখানে ঠিক যেন দুধে নুন মেশানোর মতো ভুল কাজ। সৌরভের বল নষ্ট করা একটা ভুল দিক বটে। তাই বলে ২ বলে ৮ রান করার চেয়ে ৬৬ বলে ৬৬ রান করা অনেক ভালো। তবে খেয়াল করতে হবে রান যেন বেশি হয় কিন্তু বল যেন তার বেশি কখনওই না হয়। কারণ ২০-বিশ-তে উইকেট ধরে খেলার চেয়ে বেশি প্রয়োজন কম বলে বেশি রান করা। তবে সৌরভের সুবিধা আছে ও তো বোলিংয়েও খুব ভালো। সৌরভের সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট ও যত না উইকেট নেয় তার চেয়েও কম রান দেয়। IPL-এই তা প্রমাণিত। ২০-বিশ-তে এটাই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। অর্থাৎ ব্যাটিং-এ যা কিছু ঘাটতি থাকে বোলিং-এ তার সবকিছুই পূরণ করে দেয়। বুড়ো হাড়ে ফিল্ডিং যথেষ্ঠ ভালো। বিশেষত যেখানে এটাই ওর প্রথম ২০-বিশ খেলা। ৫০-৫০ ম্যাচে যে এত ভালো খেলে অভ্যস্ত সে কখনওই হঠাৎ ২০-বিশ ম্যাচে খেলতে পারবে না। এটাই ওর প্রথম খেলা। তাও রান তো প্রথমবার খারাপ নয়। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ৪১ বলে ৫৮। ডেকান চার্জার্সের বিরুদ্ধে ৫৭ বলে ৯১। কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচেও ভালো রান। আর কী চাই। যে ভাবে সৌরভ হঠাৎ জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ে আবার নয় মাসের মধ্যে জাতীয় দলে ফিরেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৯৮ রান করেছিল, ২০০৭ ওয়ার্ল্ড কাপ খেলেছিল। তা থেকে প্রমাণিত ও ওর মনের জোরে সাহায্যে অবশ্যই ২০-২০ ও খেলতে পারবে। অর্থাৎ সোজা কথায় সৌরভ অবশ্যই ২০-বিশ ক্রিকেটের উপযুক্ত। তবে বয়সের জন্যই ওর আর বেশি ২০-বিশ খেলা মানানসই হবে না।

শঙ্খ ঘোষ শ্রীরামপুর, হুগলি-৭১২২০৩

হ্যাঁ, অবশ্যই উপযুক্ত। প্রথমেই বলি ২০-বিশ ক্রিকেটের উপযুক্ত খেলোয়াড়-এর সংজ্ঞা কী? যে ক্রিকেটার ব্যাটিং করবেন ভালো এবং সঙ্গে বোলিংটাও করতে পারবেন। সৌরভ দুটিই পারেন তাই তিনি ২০-বিশ এর উপযুক্ত খেলোয়াড়। আর আই পি এল ২০০৮-এ নাইট রাইডার্স ঠিক মতো খেলোয়াড়দের পাননি বলেই সফলতা আসেনি। কিন্তু সৌরভ তাতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ১৩ ম্যাচে ৩০০-র ওপর রান করেছেন (৩৪৯ রান)। ৭টি উইকেট পেয়েছেন ব্যাটিং স্ট্রাইক রেট ১০০-র ওপর আর বোলিং-এ প্রতি ওভারে ৬-এর নীচে রান দিয়েছেন। তিনটি অর্ধশতরান। দুটি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ। আর একটি বোলিং স্পেল ছিল যে-কোনও ভালো বোলারের পক্ষেই ঈর্ষণীয় ৩-০-৭-১। তাই সৌরভ প্রমাণ করে দিয়েছেন বয়স হার মানে প্রতিভার কাছে। তিনি ২০-বিশ ক্রিকেটের উপযুক্ত খেলোয়াড়ই বটে বা বলা যায় তিনি টোটাল ক্রিকেটার। ২০-বিশ, ওয়ান ডে আর টেস্ট ক্রিকেট—তিনটিতেই সমান দক্ষ। তিনি সৌরভ, তার ব্যাট থেকে সবসময় সুরভিত গন্ধই বের হয় যা ক্রিকেটপ্রেমীদের রোমাঞ্চিত করে।

সুদীপ্ত ব্যানার্জি বীরভূম-৭৩১১০৩

এ ছাড়া ভালো লেগেছে **ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** কাটোয়া, বর্ধমান। **সুমন্ত সিংহ চৌধুরী** দশঘরা, হুগলি। **গৌর গোপাল পাল** বাকুল, লাভপুর, বীরভূম। **দেবাশিস ঘোষ** ব্যারাকপুর-৭০০১২২।

পরের বিতর্ক

প্রতিবছর বন্যার কি কোনও প্রতিকার নেই?

পাঠাতে হবে ২২শে জুলাই-এর মধ্যে।

সজারু আর কেউটে সাপ

চিত্রনাট্য ও ছবি সুদীপ্ত মণ্ডল

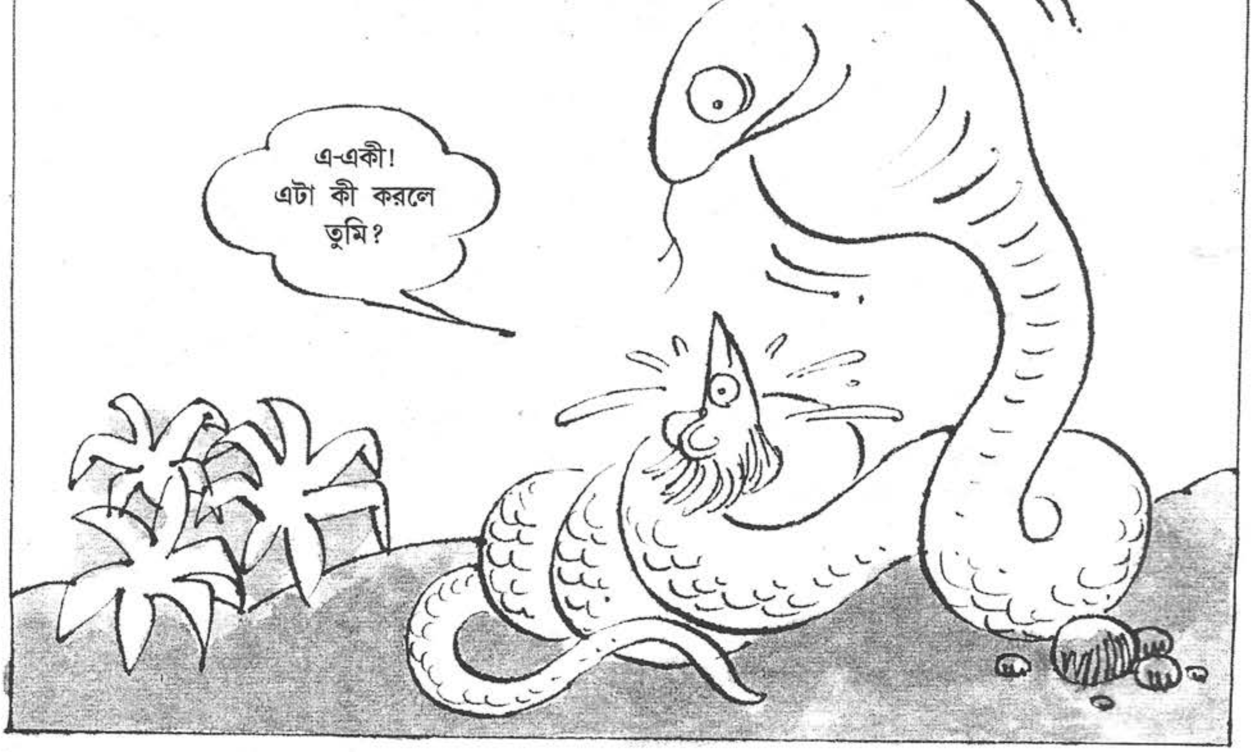

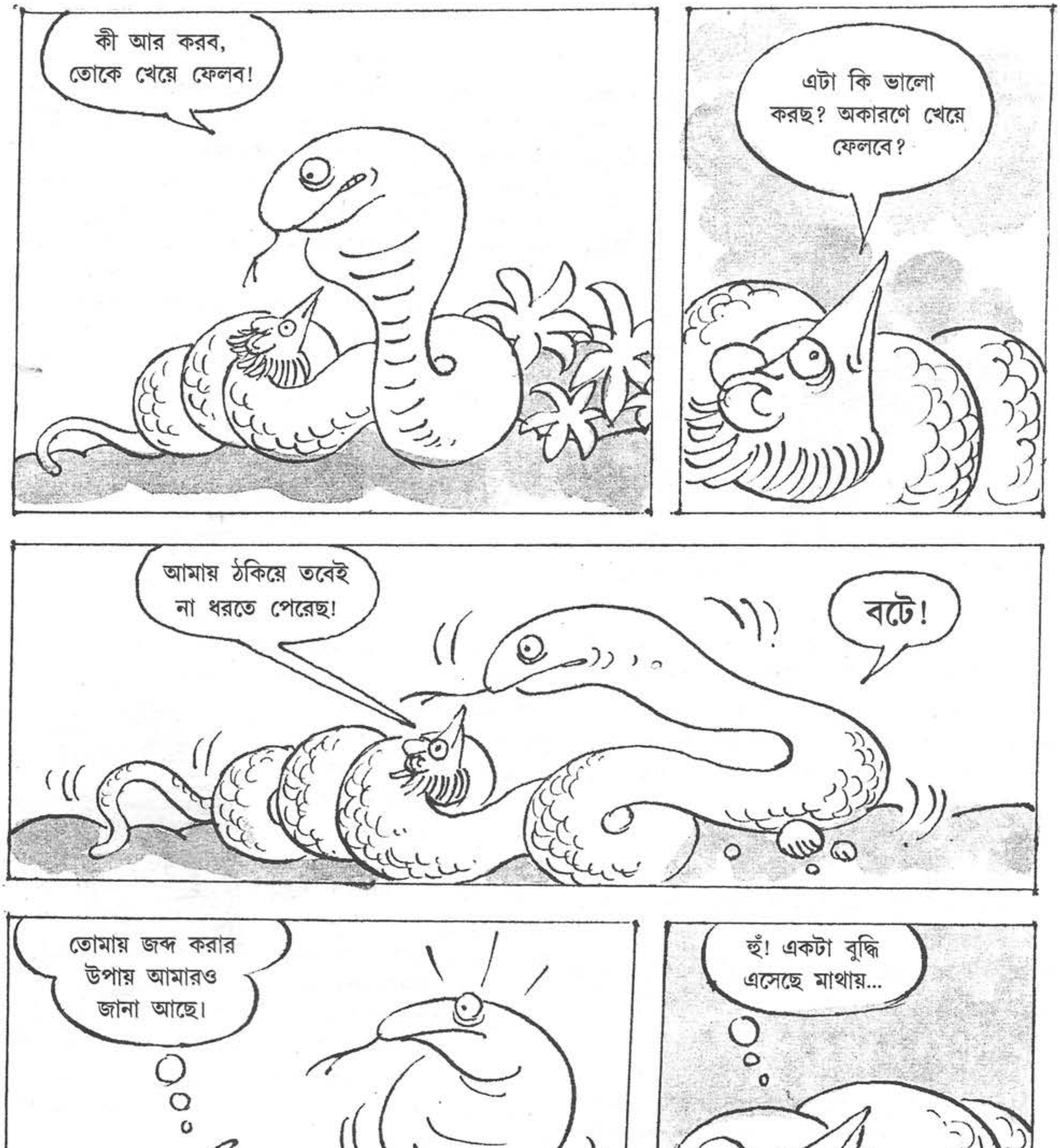
কী আর করব, তোকে খেয়ে ফেলব!
এটা কি ভালো করছ? অকারণে খেয়ে ফেলবে?
আমায় ঠকিয়ে তবেই না ধরতে পেরেছ!
বটে!
তোমায় জব্দ করার উপায় আমারও জানা আছে।
হুঁ! একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়...
চলবে

বইয়ের দুনিয়া

বড়দেরও প্রয়োজন মিটবে

ছোটদের কাছে ছোটদের মতো করে বলা একটা ব্যাপার। সকলেই সেটা পারে না। কমলবিকাশবাবুর 'সহজ কথায় মরুভূমি' পড়ে তাঁকে অন্তত এই অনুযোগ থেকে সহজেই নিষ্কৃতি দেওয়া যায়।

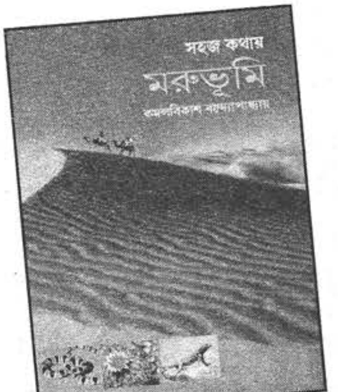

মরুভূমি বিষয়ে ছোটদের সামনে একটি পূর্ণাঙ্গ সচিত্র গ্রন্থের ভীষণ প্রয়োজন ছিল। লেখক এখানে জানার পরিধিকে যেমন বাড়িয়েছেন তেমনি নিপুণ প্রকাশভঙ্গিমার গুণে পাঠকবৃত্তে তৈরি করতে পেরেছেন অজানার প্রতি আগ্রহ। বইটি পড়ে ছোটরা তো জানবেই, বড়দেরও প্রয়োজন মিটবে।

আটাকামা মরুভূমি পৃথিবীর সবচেয়ে শুকনো মরুভূমি। সারা বছরে এখানে আধ ইঞ্চিও বৃষ্টি হয় না। পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম মরুভূমিটি রয়েছে ইরানে। আয়তনে মোটে দেড় লক্ষ বর্গমাইল। মরুভূমির মরীচিকায় মানুষের ভুল হলেও পশুপাখির ভুল হয় না। কালাহারির আদিবাসীরা নাকি শিকার করতে বেরোবার আগে হুডিয়া গোরডিনি গাছের রস খেয়ে নেয় যাতে শিকারের সময় খিদে না পায়। মরুভূমিতে নাকি সবচেয়ে বেশি দেখা যায় গিরগিটি।

মরুভূমি কী, মরুভূমি সৃষ্টির মূলে, নানা দেশের মরুভূমি, মরুঝড়, মরুভূমির বৃষ্টি, মরুদ্যান, মরীচিকা, মরুভূমির গাছপালা মরুভূমির বিস্ময়, মরুভূমির জীবজন্তু, মরুভূমির সম্পদ—প্রভৃতি এককে ভাগ করে নিয়ে আলোচনা করায় পুরো বিষয়টিই জলের মতন সহজ হয়ে এসেছে পাঠকের কাছে। ৩২ পাতার বইটি এক নিশ্বাসে পড়ে শেষ করে ফেলা যায়। বইটির শেষ অঙ্কে গ্রন্থকার শুনিয়েছেন অভূতপূর্ব এক সংবাদ। মরুভূমির বুকে বৃষ্টি নামানোর প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে আরব দুনিয়ায়। চেষ্টা চলছে কৃত্রিম পাহাড় বানানোর। পাহাড়টি দৈর্ঘ্যে হবে দশ কিলোমিটার উচ্চতায় তিন হাজার মিটার।

বইটির জন্যে ৩০ টাকা খরচা করলে পাঠকের পয়সা বিফলে যাবে না।

সহজ কথায় মরুভূমি কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় **পত্র ভারতী** ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৯ ত্রিশ টাকা।

শুভাশিস ঘোষ

ছন্দের বিষয়ে সাবধান

দুই মলাটে দুই ছড়াকারের অনেকগুলি ছড়া একসঙ্গে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে, যারা ছড়া ভালোবাসে তাদের জন্যে। শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ছড়া আছে চল্লিশটি, স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছড়া সংখ্যায় একটু কম, ঊনত্রিশ। তা হোক, ছড়া বানানোয় কেউই বিশেষ কম যান না—শিবনাথ লিখেছেন 'দুষ্টু ভূতের শান্ত মা' তো স্বপনকুমার লিখেছেন 'হুলো বেড়ালের কাণ্ড'। শিবনাথ লিখেছেন 'বীর সন্ন্যাসী'কে নিয়ে তো ইনি লিখেছেন 'মহান যীশু'-কে নিয়ে, একজনের চিন্তায় 'অ্যানাকোন্ডা' অন্য জনের চিন্তায় 'তিনটে পাখি'। দুজনের ছড়াই বেশ মজাদার।

শিবনাথ লিখেছেন ঃ 'ব্যাঙ খায় ফরাসিরা
আরশোলা চীনা,
দেবু খায় মাছ-ভাত
বাঙালি সে কিনা।'

স্বপনকুমার লিখেছেন ঃ 'নাম না জানা তিনটে পাখি,
পাতার পাশে মুখটা ঢাকি
কিচির মিচির সুরে,
মাতাল হাওয়ায় দুলছে ডালে,
কাটছে সময় ছন্দে তালে
সোনালি রোদ্দুরে।'

মজার মজার ছড়া আছে অনেক, সেগুলো যাদের জন্যে লেখা তাদের ভালোও লাগবে খুব, কোনও সন্দেহ নেই। ছড়াকাররা আরও অনেক বই তো ছোটদের উপহার দেবেন, তাই একটু খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু ছন্দটার ব্যাপারে—যাদের খুব পাকা কান তারা এই ব্যাপারে একটু অসাবধান হলেই ধরে ফেলবে। যেমন কিনা—'চল যাই শ্রাবণের ঝুলন মেলায়/হৈ হৈ রৈ রৈ/এক সাথে করবই/সময় কেটে যাবে খুশির খেলায়' বা 'ভারতমাতার মুক্তির লাগি/তুমি বীর সন্তান/স্বাদেশিকতার আদর্শে/সঁপে দিলেন নিজ প্রাণ' (দুটোই শিবনাথের। অথবা, 'হোস কেন জেরবার?/চাকরির পরীক্ষায়/জানা খুব দরকার!' বা 'যখনই ডাকে কেউ, কোথায় হাতি সিং/'ইধ্যার হ্যায় বাবু' বলে নাচে তা তা ধিন ধিন' (দুটোই স্বপনকুমার)।

কবি শ্রীপবিত্র মুখোপাধ্যায় বইয়ের শুরুতেই কবিদের নিয়ে চমৎকার দুটি লেখা লিখেছেন—'কিছু কথা' এবং 'কিছু বলতেই হয়'। লেখা দুটো আগে পড়ে নিলে ছড়ার মজা জমবে ভালো।

হাসির মেলায় খুশির খেলায় শিবনাথ চট্টোপাধ্যায় ও স্বপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, **পদ্ম-গঙ্গা পাবলিকেশন** ভি আই পি নগর, তিলজলা, কলকাতা ৩৯, ত্রিশ টাকা।

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

স্নেহাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

টাটকা ছড়া

টাটকা ছড়া লিখবে বলে
সেদিন খুড়ো নন্দ,
থলে হাতে চলল বাজার
কিনতে কিছু ছন্দ।

ছন্দ কিনে নন্দ খুড়ো
কিনল কিছু সুর,
লিখবে ছড়া, মনটা যে তার
খুশিতে ভরপুর।

সুর কিনে সে কিনল আরও
খুচরো কিছু তাল,
লিখবে ছড়া নানান স্বাদের
টক-মিষ্টি-ঝাল।

অবশেষে কিনল সে
মনের মতো ভাষা,
এসব নিয়েই লিখল খুড়ো
টাটকা ছড়া, খাসা।

গৌতম হাজরা

ছড়িয়ে ছিটিয়ে

একটা ছড়া রোদের
আর একটা ছড়া বৃষ্টির,
একটা ছড়া ভাঙার
আর একটা ছড়া সৃষ্টির।

একটা ছড়া খুশির
আর একটা ছড়া দুখের,
একটা ছড়া জ্ঞানীর
আর একটা ছড়া মূর্খের।

একটা ছড়া ফলের
আর একটা ছড়া ফুলের,
একটা ছড়া সঠিক
আর একটা ছড়া ভুলের।

একটা ছড়া তোমার
আর একটা ছড়া আমার,
একটা ছড়া ছুটছে
আর একটা ছড়া থামার।

এমনি হরেক ছড়া
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেই,
হাত বাড়ালেই বন্ধু
তোমার আমার কাছেই!

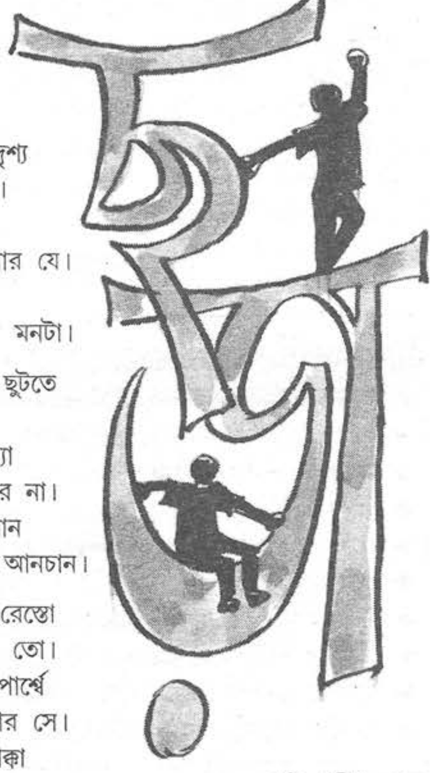

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

মায়া তুলি

যারা কোনওদিন যায়নি পাহাড়ে, দ্যাখেনি তুষার দৃশ্য
গভীর গোপন কষ্টকে পুষে, যারা হয়ে যায় নিঃস্ব।
তাদের জন্যে মায়া তুলি এক সুদূর মেঘের রাজ্যে
কোন রূপটানে ফোটায় পাহাড়, দুঃখ থাকে না আর যে।
সুদূর স্বপ্ন হাতছানি দ্যায়, বাজে পাহাড়ের ঘণ্টা
কি এক খোয়াবে ডুবে যায় খুব, আলো হয়ে যায় মনটা।

যারা কোনওদিন সাগর দ্যাখেনি, ঢেউকে দ্যাখেনি ছুটতে
অশ্রুসজল চোখদুটো নিয়ে হয় যদি মাথা কুটতে।
তাদের জন্যে মায়া তুলি এক কাশফুলে আনে বন্যা
হাওয়ায়-হাওয়ায় হিল্লোল তুলে বলে যেন ঢেউ ধর না।
জোছনায় সব ফেনায় ফেনিল, সমুদ্র যেন গায় গান
কি এক খোয়াবে ডুবে যেতে-যেতে মনটাও করে আনচান।

যারা কোনওদিন যায়নি কোথাও পকেটেতে নেই রেস্তো
মায়া তুলি এক বন্ধু তাদের, যেন বলে যায় বেশ তো।
নাই বা তোমার দূরে যাওয়া হল, সুদূর তোমার পার্শ্বে
সেই খুলে দেবে রূপের ঝরনা, দুঃখ দেবে না আর সে।
ঝাপসা চোখের বাষ্প বিলীন, লাগে জোয়ারের ধাক্কা
নিকট সুদূর সব একাকার, মানস ভ্রমণ পাক্কা।

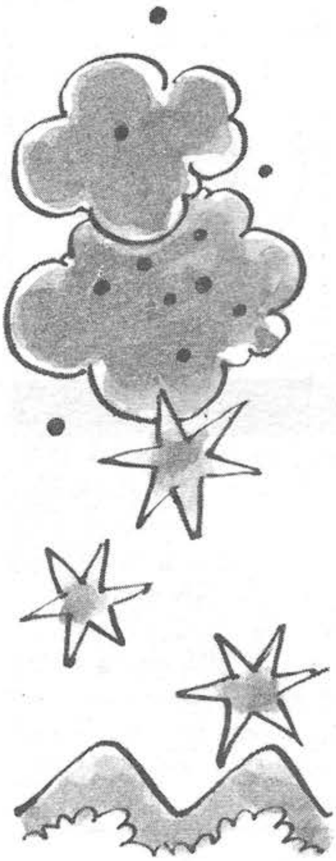

ছবি সুদীপ্ত মণ্ডল

হরেক রকম

এটাই ঘটনা

● ৭৪ বছরের বৃদ্ধ ওলগা মরিয়েলো বাজার থেকে কিনে এনেছিলেন এক ব্যাগ আলু। তারপর সেই আলু ভালো করে ধুয়েটুয়ে রান্নায় চড়াতে গিয়ে ওলগার গিন্নি তো হতভম্ব। আরে, কয়েকটা আলু এত ভারী লাগছে কেন! শেষমেশ দেখা গেল আলুর মতন জিনিসগুলো আসলে হাতবোমা। আর একটু হলেই ওলগাদের সপরিবারে মরতে হয়েছিল আর কী!

● বই পড়ে রোগ সারে। এমনটা শুনেছ কখনও তোমরা? কয়েকজন খ্যাতিমানের অভিজ্ঞতা কিন্তু এমনটাই বলে। চিররুগ্ন রবার্ট লুই স্টিভেনসন ক্ষয়রোগে ভুগতেন। তাঁর দাঁতে ও বুকে ব্যথা করত মাঝে-মাঝে। তিনি জানিয়েছেন 'অ্যাডভেঞ্চারস্ অব শার্লক হোমস' পড়ে তাঁর এই ব্যথা অনেকটাই দূর হয়েছিল। হ্যাজলিটের বদহজম নাকি ভালো হয়েছিল হেনরি ফিল্ডিং-এর 'টম জোন্স' পড়ে। আরও শুনবে? ব্রিটিশ লেখক রিচার্ড ল্য গ্যালিয়েন জানাচ্ছেন লিও তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' নাকি হাঁপানির বেশ আরামদায়ক ওষুধ। সেইসঙ্গে শেক্সপিয়র পড়লে বাতের রোগ সেরে যায়।

বুলওয়ার লিটন বলেছেন শ্রীমতী থ্রেইলের আত্মজীবনী পড়ে তার ইনফ্লুয়েঞ্জা পুরোপুরি সেরে গিয়েছিল।

● বেড়ালের নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট! হয় কখনও? কিন্তু এমনটাই হয়েছে। কুইন্সল্যান্ড ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্কের খাতাপত্রে চোখ বোলাতে গিয়ে ম্যানেজারের তো চক্ষু চড়কগাছ। এরকমটা হল কীভাবে? বেড়ালটার মালিক নাকি একদিন ব্যাঙ্কে এসে তার পোষ্যটির নামে এই অ্যাকাউন্ট খুলে গিয়েছেন।

● ওহাইয়োর এক সুখী দম্পতি জেন্না ও উইলিয়াম কটনের তিন সন্তানের নাম যথাক্রমে এডেন, লোগান ও কেইলা। তিনজনেরই জন্ম হয়েছিল একই দিনে। প্রথম জনের ২০০৩-এর ২ অক্টোবর, দ্বিতীয় জনের ২০০৬-এর ২ অক্টোবর, তৃতীয় জনের ২০০৭-এর ২ অক্টোবর!

পাজল

মে সংখ্যার সমাধান

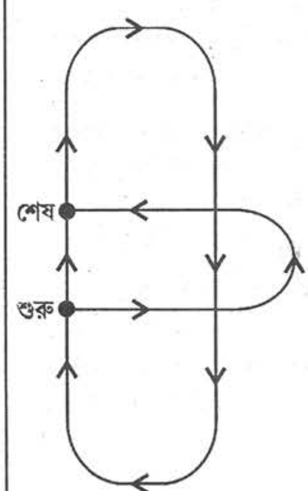

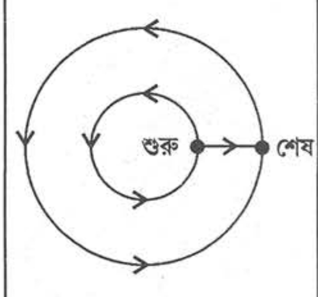

জবাব চাই জবাব দাও

● হ্যারি পটারের গল্পে কোন পাখি 'ডাক' বয়ে নিয়ে যেত?
● 'মজন্তালি সরকার' সুকুমার রায়ের কোন গল্পের চরিত্র?
● প্রাচীন অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হত কোন শহরে?
● ১৯৮৪-র অলিম্পিক হকিতে (পুরুষ) সোনা পেয়েছিল কোন দেশ?
● উত্তমকুমার ও অপর্ণা সেন অভিনীত ছোটদের জনপ্রিয় ছবিটি কী?
● 'শোলে' ছবিতে হেমা মালিনীর ঘোড়াটার কী নাম ছিল?
● জৌনপুর শহর কার স্মৃতিতে স্থাপিত হয়েছিল?
● আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কে?
● ভারতীয় বংশোদ্ভুত কোন মার্কিন মহাকাশচারিণী মহাকাশ-দুর্ঘটনায় নিহত হন?
● বল্লবভাই প্যাটেলকে 'সর্দার' উপাধিটি কে দিয়েছিলেন?

জবাব চাই, জবাব দাও-এর মে সংখ্যার উত্তর

● ওরা কাজ করে। ● রবীন্দ্রনাথের ছোটছেলে শমীন্দ্রনাথ। ১৩১৩ সালে শ্রীপঞ্চমীর দিন এই উৎসব হয়। ● স্মরণ কাব্যগ্রন্থ। ● বঙ্গদর্শনে। ● রাজলক্ষ্মী দেবী। ● 'অ্যান এনিমি অব দ্য পিপল' অবলম্বনে গণশত্রু। ● সত্যজিতের সম্পাদিত পত্রিকার নাম সন্দেশ। ● চিড়িয়াখানা। ● ব্রায়ান লারা। ● পথের পাঁচালি ইন্দির ঠাকরুণ

উত্তরদাতাদের নাম ঃ **বিমল কুণ্ডু** গড়িয়া, **চুমকি সেন** গোঘাট, **শুভজিৎ দে** শ্যামবাজার, **পিন্টু দেবনাথ** আসানসোল।

হরেক রকম

সুদোকু

৪		৭					৫	৩
			৫	৪		১	৬	
২		৬		৩	১		৭	৪
৭		৫			৩		৪	৬
৩		৯	৬	৮	৪	৫		৭
	৬		৭					৯
৬	৭			১		৪		৫
	৪	১		৭	৫			
৫	৩					৭		১

মে সংখ্যার সমাধান

৭	৬	৮	৯	৩	৪	৫	১	২
৪	২	৩	৫	১	৭	৯	৮	৬
৯	১	৫	২	৬	৮	৪	৩	৭
৫	৭	১	৪	৮	৬	২	৯	৩
২	৯	৬	৩	৭	৫	৮	৪	১
৮	৩	৪	১	৯	২	৬	৭	৫
৬	৫	৭	৮	৪	৩	১	২	৯
১	৪	২	৭	৫	৯	৩	৬	৮
৩	৮	৯	৬	২	১	৭	৫	৪

উত্তরদাতারা হলেন ঃ প্রিয়াঙ্কা বিবাড় পর্ণশ্রী, কলকাতা-৬০, কৌস্তভ রায়চৌধুরী, রাজপুর

এমনভাবে ৯x৯ ছকটি পূর্ণ করো, যাতে প্রতিটি অনুভূমিক সারি, প্রতিটি স্তম্ভ এবং প্রতিটি ৩x৩ খোপে ১—৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলি থাকে। দেখো, একই সারি, স্তম্ভ অথবা খোপে কোনও সংখ্যা যেন দুবার না আসে।

ছড়া থেকে ছবি

বিষয় বর্ষা। প্রথম চারটি লাইন লিখে দিলেন শুভাশিস ঘোষ। লেখা ও ছবির সঙ্গে তাল মিলিয়ে শেষ দুটো লাইন লিখবে তোমরা...

জোরসে যদি বৃষ্টি আসে,
পাঁচ মিনিটেই শহর ভাসে।
কোথাও কোমর কোথাও গলা
ঠনঠনিয়া, মানিকতলা।

মে মাসের সমাধান

প্রথম

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাটোয়া, বর্ধমান

দ্বিতীয়

কুন্তল ভট্টাচার্য কলকাতা ৭০০ ০২০

ভালো লেগেছে ঃ **মৈনাক বিশ্বাস, মহুয়া সেন, চুমকি সেন, সৌম্য হালদার** ও অনেকের ছবি।

ছবিটা কীসের বলো তো!

হরে কর কম

শুরু হল নতুন বিভাগ SMS Fun Club

Most innocent and cutest dhamki.
Ever as the thief was leaving the house. The kid woke up and said to the thief, 'mela school bag bhi le jao, warna mummy ko jaga dunga.'

Dithi Bhattacharya Kolkata-41

You are very R = Rare
A = Attractive
M = Marvellous
C = Charming
H = Helpful
A = Ambitious
G = Gorgeous
O = Optimistic
L = Lovely
In short U are a 'RAMCHAGOL'

Sandip Kundu Bankura

Skul Ki lyf
10+2 tak...
Colg Ki lyf
Pado Jab Tak...
Luv Ki lyf
Shadi Tak...
Par Saccha Dosti
31 Feb Tak...
Jab ayega tab tode dengay.

Mili Durgapur

Read this GODISNOWHERE
What did u read ?
God is no where or God is now here!
Just a beautiful way to say—
Life is how u look at it,
So enjoy it in new way u like. —

Suparno Sarkar Barabazar, Hooghly

Agar duniya main kuch karkay dikhana chahata ho to hatthi ki uppar ulta ho kar photo khicho. Aur ush photo ko ulta karkay duniyabalo ko dikha do.

A. Rahaman Raiganj

Chicken ready? —Yes Boss.
Fish ready? —Yes Boss.
Omlet ready? —Yes Boss.
Mutton ready? —No Boss. Bakra abhi SMS par raha hai!

Gourab Pal Coochbehar

শুরুতে KB# তারপরে Space দিয়ে Message লিখে পাঠিয়ে দাও 9903034477 নম্বরে। পছন্দ হলে ছাপা হবে। শেষে নাম ও ঠিকানা না দিলে সেই SMS ছাপা হবে না।

শব্দব্রহ্মা

৮X৮ ছকে শব্দব্রহ্মা তোমরাও লিখে পাঠাও। ভালো হলেই ছাপা হবে।

১		২		৩	■	৪	■
■	■		■	৫			
৬			■		■	■	■
	■	■	■	৭			৮
৯			১০	■	■	■	
■	■	■		■	১১		
১২	১৩			■		■	■
■		■	১৪				

গৌরাঙ্গ বন

পাশাপাশি ঃ ১) নবরত্নের অন্যতম ৫) অতি ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত ৬) মূল্যবান খাট ৭) হিমালয় ৯) পলাশফুল ১১) গোলাকার ১২) বৃহস্পতি ১৪) কাজকর্ম।
ওপর-নীচ ঃ ২) কমণ্ডুলু, ভিক্ষাপাত্র ৩) করুণাময় ৪) চন্দ্র ৬) শিবিকা ৮) মাংস, মিষ্টান্নবিশেষ ১০) মেরুদণ্ড ১১) ব্রাহ্মণবালক ১৩) জিনিস, পদার্থ।

শব্দব্রহ্মার মে সংখ্যার উত্তর

পাশাপাশি ঃ ১) উর্মিমালা ৫) রঙিন ৭) কমলিকা ৯) চিকুর ১১) অমর ১২) বার বার ১৩) শারদ ১৪) নন্দরানী। **ওপর-নীচ ঃ** ২) মালাকর ৩) তারকা ৪) অনন্তমরণ ৬) পঁচিশে বৈশাখ ৮) লিলি ১০) বর ১১) অরবিন্দ ১২) বাদল।
সঠিক উত্তরদাতা **সুস্মিতা দাস** বাবুরবাগান কমপ্লেক্স, কলকাতা ৭০০ ০৫৯

হ্যালো হরে কর কম

পি সি সরকার (জুনিয়র) ৯৮৩০২৬১৬০০
ইন্দ্রানী দত্ত ৯৮৩০০২০৩৪৮/২৪২৪ ৩১১৮
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় ২৫২১ ২০০০/২৫৫০
নারায়ণ দেবনাথ ২৬৭৮ ৪১৫০
শ্রীলেখা মিত্র ৯৮৩১১ ৬৮১৬২/২৫৫১ ৩৪৩৭

E-mail: kishorebharatipatrika@gmail.com.
তোমরা এই E-mail ID-তে তোমাদের মনের কথা পাঠাও। পত্রিকা সম্পর্কে মতামতও পাঠাতে পারো।

পরিচালক **বিচিত্র সেনাপতি** ছবি **সুদীপ্ত মণ্ডল**

মূল কাহিনি **শিবরাম চক্রবর্তী** চিত্রনাট্য ও সংলাপ **ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়**
ছবি **প্রদীপ চক্রবর্তী**

হর্ষবর্ধনের চৌকিদারি

5 JULY 2008 Rs. 10.00

Postal Regn. No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP-149/2007-09
N.P. Regn. No. RNI 16599/68

পত্র ভারতীর সাড়া জাগানো নতুন বই

কিশোর সাহিত্য

হেমেন্দ্রকুমার রায়
কিশোর ভৌতিক সমগ্র ৩ ১০০.০০
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র ২৫০.০০
কর্নেলের ভূত-প্রেত রহস্য ৫০.০০
দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
নীল ঘূর্ণি ৭০.০০
সম্পাদিত **শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৩৭৬** ১২০.০০
অদ্রীশ বর্ধন
মাকড়সা আতঙ্ক ৭০.০০

অনীশ দেব
ভয়পাতাল ১২০.০০
কেমন করে কাজ করে যন্ত্র ৩৫.০০
চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
ভয়ংকরের বিভীষিকা ৫০.০০
ড. দিলীপ বসু
বিতর্কিত বিজ্ঞানী **ভার্নার হাইজেনবার্গ** ৩৫.০০
বিতর্কিত বিজ্ঞানী **রবার্ট ওপেনহাইমার** ৩৫.০০
ময়ূখ চৌধুরী
রুদ্ধশ্বাস কমিকস ৩৩.০০

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
সহজ কথায় মহাকাশ ৩০.০০
সহজ কথায় সমুদ্র ৩০.০০
সহজ কথায় মরুভূমি ৩০.০০
শিবরাম চক্রবর্তী
হর্ষবর্ধন হতভম্ব ৩৩.০০
নারায়ণ দেবনাথ
নন্টে ফন্টে বনাম কেল্টুদা ৩৯.০০
চণ্ডী লাহিড়ী
নেংটি ৩০.০০

বয়স্কসাহিত্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ভালোমন্দ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ৮০.০০
ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
অসি বাজে ঝনঝন ৫০.০০
অদ্রীশ বর্ধন
অসহ্য সাসপেন্স ৩ ১০০.০০
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
তিনটি প্রেমের উপন্যাস ১০০.০০
বরুণ চন্দ
সাপের ঝাঁপি ৯০.০০
নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
প্রেমিক কয়েকজন ৬০.০০
মনোজ সেন
কালরাত্রি ৬০.০০

সমরেশ মজুমদার
কলিকাতায় নবকুমার ২০০.০০
স্বপ্নেই এমন হয় ৭০.০০
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
তিলোত্তমার প্রেমিক ১০০.০০
বীথি চট্টোপাধ্যায়
চোখের বালি ৫০.০০
কে. সি. যোগ
যোগাসনে রোগ-আরোগ ৫০.০০
স্বপন বক্সী
কাছাকাছি বেড়িয়ে আসি ৫০.০০
কমল চৌধুরী
বাংলায় গণ আন্দোলনের ছয় দশক (দ্বিতীয় খণ্ড) ২০০.০০

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
পনেরোটি উপন্যাস ২০০.০০
রাজ রাজেশ্বরী শ্রীমা ৭০.০০
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বিরাজ বৌ ৪০.০০
বড়দিদি ২০.০০
দত্তা ৬০.০০
মহম্মদ সেলিম
কুলসুম ৫০.০০
শতরূপা
পনিরের নানারকম ২৫.০০
ঘরোয়া রান্না ২৫.০০
মিঠাই ২৫.০০
আলুর রকমারি রান্না ২৫.০০

ফোন করলেই বাড়িতে বই

পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯ ফোন ২২৪১ ১১৭৫, ২৩৫০ ১৯৪৪ ও ৯৪৩৩০ ৭৫৫৫০
e-mail : kishorebharatipatrika@gmail.com & patrabharati@gmail.com

এছাড়া ক্রসওয়ার্ড, স্টারমার্ক, সাউথ সিটি, সিটি সেন্টার, ISPCK, বিগবাজার, চার্ণক সিটি, দে'জ এবং অন্যান্য বুক-মল ও দোকান।